বর্তমান বিশ্ব

বাংলাদেশ



রেখাচিত্র ঃ জয়নাল আবেদিন

বাংলাদেশ

সুব্রত ব্যানার্জী

অনুবাদ

করুণা ব্যানার্জী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

1985 (শক 1907)

মূল্য ঃ **Rs. 17.50**

BANGLADESH *(Bengali)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিউটি প্রিন্ট, পাহাড়গঞ্জ, নয়াদিল্লি 110055 থেকে মুদ্রিত।

বাংলাদেশের অসমাপ্ত বিপ্লবের জন্যে
যে চেনা মুখগুলো,
আর হাজার হাজার অচেনা মুখ
তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে,
তাদের প্রত্যেকের স্মৃতির উদ্দেশে অর্পিত।

অবতরণিকা

লেখক বাংলাদেশের বিপ্লবকে অসমাপ্ত বলেছেন। তবে একথা অস্বীকার করা কঠিন যে এর বিয়োগান্ত নাটকের নবতম অঙ্ক শেষ অঙ্ক নয়। এখন যাকে বাংলাদেশ বলা হয়, সেখানকার মানুষ এত বছর ধরে আত্মপরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল বা চেয়ে আসছিল কিনা, সে প্রশ্ন তর্কসাপেক্ষ, তবে এ কথা তর্কাতীত যে, এই সংগ্রামের গতিবেগ বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ত্বরান্বিত হয়। এর শুরু হয়েছিল সংখ্যালঘু হিন্দু জমিদার এবং অন্যান্য পেশাদারী শ্রেণীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংগ্রাম হিসাবে। উপমহাদেশের বিভাজনের পরে তা পশ্চিম পাকিস্তানের সহ-নাগরিকদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের বিদ্রোহে পরিণত হয়। 1954 ও 1970 সালে, একমাত্র যে দুটি সময়ে দেশে স্বাধীন ও সুস্থ নির্বাচন অনুমোদিত হয়েছিল, জনগণ তাদের মনোভাব দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করে। রক্তক্ষয় ও যন্ত্রণার অফুরন্ত দাম দিয়ে তারা স্বাধীনতা অর্জন করল 1971 সালে। কিন্তু এখানেই তাদের দুঃখের শেষ নয়। বিভিন্ন কারণবশতঃ এক ঘটনাপরম্পরার উদ্ভব হয়, যার চূড়ান্ত পরিণাম ঘটে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সমগ্র পরিবারের নিধনে, এবং তারই কয়েকমাস পরে তাঁর প্রধান কর্মসঙ্গীদের হত্যায়, দেশের বিকল্প নেতৃত্বের স্থান যাঁরা পূরণ করতে পারতেন। এ কাহিনী বড় করুণ। বইয়ের শেষ দুই পরিচ্ছেদে সুব্রত ব্যানার্জী তার পরিস্ফুট বিবরণ দিয়েছেন। এ কাজে তিনি বিশেষভাবে দক্ষ এই কারণে যে ভারতীয় হাই কমিশনের উচ্চপদস্থ সদস্য হিসাবে তিনি বাংলাদেশে তিন বছর কাটিয়েছেন, ও স্বয়ং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন। এক নেতার স্বাধীনতাবিরোধী যন্ত্র দিয়ে সদ্যমুক্ত দেশের প্রশাসন চালানোর করুণ প্রচেষ্টা, শাসকদলকে দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যর্থতা, এবং অবশেষে রাজনীতি ও প্রশাসন ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনে অতীতের সঙ্গে আমূল বিচ্ছেদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষকে পরিবর্তনের জন্যে অগ্রিম প্রস্তুত না করেই তিনি বহু প্রাচীন জমি ভোগদখলের ব্যবস্থাতে পরিবর্তন আনলেন, যা লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ কৃষকের পক্ষে ছিল প্রতিকূল। এ জন্যে তাঁকে কঠিন দাম দিতে হল। কিন্তু মানুষ ও ঘটনার নির্মম বিচারক ইতিহাস। তাঁর ভাবমূর্তিতে যে মেঘ নেমে এসেছিল, মনে হয় সে মেঘ অপসৃয়মান, এবং কে বলতে পারে, মৃত মুজিব হয়তো একদিন জীবিত মুজিবের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী প্রতিপন্ন হবেন।

এপ্রিল, 1979 —সুবিমল দত্ত

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ এত কাছে, তবু এত দূরে। মনে হয় ভৌগোলিক নৈকট্য মানসিক স্বাতন্ত্র্যের দূরত্ব ঘোচাতে অক্ষম। আমাদের পূর্বসূরী, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অভিন্ন। তবুও আমাদের পরস্পরের সম্পর্কে সন্দেহ ঘোচে না। একথা স্বীকার্য যে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের উত্তরাধিকার এই সন্দেহ। অবশ্য আর একটা বৃহৎ কারণ হচ্ছে, পরস্পর সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

ভারতে অনেক সময়ে ধরে নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হওয়ায় হিন্দুদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, অতএব ভারতবিরোধী। বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার পর আমি বার বার এই অনুমানের সম্মুখীন হয়েছি। আমার ব্যাখ্যার জবাবে প্রায়ই পেয়েছি হয় উন্মুক্ত অবিশ্বাস, অথবা নির্বাক বিভ্রান্তি। প্রাচীন সংস্কার সহজে মরে না।

সেই কারণেই আমি এই বই লিখতে চেয়েছি। আমি মনে করি, বাংলাদেশে আমার অসংখ্য বন্ধু ও পরিচিতজন, যাঁরা আমাকে ও আমার পরিবারের সকলকে উদারহৃদয়ে তাঁদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও আতিথেয়তা বিতরণ করেছেন, তাঁদের কাছে এ আমার ঋণ স্বীকার। নারীপুরুষ নির্বিশেষে, সাম্প্রদায়িকতা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তরণের যন্ত্রণা, সন্দেহ, আতঙ্ক, আশঙ্কা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার ভাগীদার করে নিয়েছেন আমাকে।

আমার সেই সমৃদ্ধ ও মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে আমি এখানে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি, যাতে মানুষের মনগুলো দূরত্বের বাধা অতিক্রম করে কাছাকাছি আসে। স্বাধীনতা-উত্তর সঙ্কটের দিনগুলিতে আমাদের হাই কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কাজ করার যে সুযোগ ভারতসরকার আমাকে দিয়েছেন, আমার এই অভিজ্ঞতার জন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে যেহেতু তদানীন্তন হাই কমিশনার সুবিমল দত্ত আমাকে কূটনৈতিক আচরণের বাধানিষেধ লঙ্ঘন করে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্যেও আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার আমার ধন্যবাদার্হ, কারণ তাঁরা আলোকচিত্র ও প্রাসঙ্গিক উপাদানের জন্যে আমার অনুরোধ অতি ত্বরিতে রক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার বন্ধু অমরবন্ধু রায়চৌধুরীর সহায়তার স্বীকৃতি দিই, ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনে তিনি কিছুদিন তথ্য উপদেষ্টা ছিলেন। আলোকচিত্রের জন্যে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের আলোকচিত্র বিভাগ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ দফতরও আমার ধন্যবাদার্হ।

জি. এস. বিন্দ্রা, কুমারী নির্মলা ও ভি. আর রমণ, যাঁরা ধৈর্য ধরে আমার হাতের লেখার পাঠোদ্ধার করে একটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন মুদ্রলিখন তৈরী করেছেন, তাঁরা বিশেষভাবে ধন্যবাদের যোগ্য।

শেষ করছি এই আশা নিয়ে যে আমার প্রচেষ্টা ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা সমদর্শিতাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

নয়াদিল্লি
এপ্রিল, 1979

—সুব্রত ব্যানার্জী

সূচীপত্র

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

—**শামসুর রহমান**

এক

বাংলার মুখ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাইনা আর :

—জীবনানন্দ দাশ

নদীর যেন অন্ত নেই। বঙ্কিম গতিতে বয়ে চলে উচ্ছল জলধারা। অকৃপণ সবুজের রূপে উঁচু জমিগুলো ঝলমল করে। ঢেউখেলানো পাহাড়ের চূড়ায় গাছগুলোকে দেখায় ঝাঁকড়া চুলের মত। ভাপে ঘেমে ওঠা গ্রীষ্মমণ্ডলের অরণ্যের নিঃশ্বাসে ধোঁয়া ওঠে। রূপালী বালুচর আর ফেণার বুদ্বুদে ভরা অস্থির ঢেউয়ের মাতামাতি। এদের নিয়ে বাংলাদেশেব রূপরেখা। তিন মহানদীর উৎক্ষিপ্ত পলিমাটিতে তার জন্ম। তার স্বভাবসৌন্দর্য পলিমাটির মতই কোমল আর স্নিগ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে বাংলাদেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগসেতু। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সাধারণ সীমান্ত ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কথা বাদ দিলে, বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এলাকা দিয়ে ঘেরা। এর পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার, পূবে আসাম ও ত্রিপুরা, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়। ভারত পার হয়ে এর পড়শী হল উত্তরে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের বিরাট ভূখণ্ড।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর গুরুত্ব অনেকখানি, শুধু একথা বললেই সবটা বলা হল না। নদীর খামখেয়ালী গতিছন্দে এখানে ধ্বংস ও সৃষ্টি চলেছে হাত ধরাধরি ক'রে। কত জমি তলিয়ে গেছে, কত জমি গড়ে উঠেছে। সেই অবাধ জলস্রোত যেমন সেখানকার ইতিহাস ও মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে, তেমনি ছায়া ফেলেছে তার জাতীয় চরিত্রে। অধিকাংশ নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের পূর্বদিকে। বরফগলা জল অবশেষে এসে মেশে তিনটি মহানদীর জলে। এই তিন মহানদী

বাংলাদেশের বুকের মধ্য দিয়ে বয়ে মিলিত হয় বঙ্গোপসাগরে। এদের নাম গঙ্গা যাকে বলা হয় পদ্মা, ও ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা, এবং মেঘনা। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা দিয়ে তারা দেশটাকে গোলকধাঁধার মত জলের জাল বুনে ভাগ করেছে। এই তিন নদী ছাড়া, আছে উত্তরবাংলার, চট্টগ্রাম পাহাড় অঞ্চলের ও সংশ্লিষ্ট সমতলভূমির নদনদী।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক চরিত্র প্রধানতঃ এক বিরাট, অবন্ধুর পলিমাটিসমৃদ্ধ সমতলভূমি। অসংখ্য বড় ও ছোট নদী, স্বভাবনির্মিত খাল, বাঁধের জল, বিল ও জলাভূমি তার উপরে আঁকজোক কেটেছে। শুধুমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে আরাকান ইয়োমার বহিঃসীমান্ত ঘিরে পাহাড়-পর্বতের শোভা। পলিমাটির পুরোন আস্তরণ উত্তর থেকে পূবে তির্যকভাবে পথ করে নেওয়ায়, পরবর্তী যুগের আস্তরণে তৈরী নীচু সমতলভূমির একঘেঁয়েমির মধ্যে এক আশ্চর্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। মাইলের পর মাইল, বিস্তীর্ণ সমতল, জলস্নাত ভূমির মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয় পুরোন পলিমাটির ঢেউখেলানো স্তরে লালচে মাটিতে তার নিজস্ব মহুয়া আর শালগাছের বন।

নতুন রাষ্ট্রজাতি হলেও, বাংলাদেশ বহু প্রাচীন দেশ। এর প্রথম উল্লেখ সম্ভবতঃ পাওয়া যায় খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ। এতে মগধের পূর্বদিকে প্রতিবেশী দেশকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৌধায়নের 'ধর্মসূত্র'-এ কলিঙ্গের প্রতিবেশী বলে এর উল্লেখ আছে। কথিত আছে, বঙ্গের এক রাজা দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মহাভারতে আসলে দুজন রাজার নাম দেওয়া আছে, চিত্রসেন ও সমুদ্রসেন। 'হরিবংশ' গ্রন্থের সঙ্গে একযোগে 'মহাভারত' ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত দেশকে বঙ্গ নামে বর্ণিত করেছে। কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' গ্রন্থে এর পুনরুল্লেখ করেছেন।

বঙ্গের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খ্রীস্টযুগেও অনেকদিন পর্যন্ত স্বীকৃত। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন, দেবখড়্গ নামে তখন এক রাজা বঙ্গের শাসক নামে খ্যাত। এমনকি একাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গ বা বাঙ্গালকে ভাগীরথীর পূর্বদিকে স্থিত সমগ্র দেশ ও সমস্ত দক্ষিণ সমুদ্রতটের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে কিছু তাম্রলিপিতে একই দেশকে নির্দেশ করে এই দুটি নাম পাওয়া যায়। ঢাকার বাংলাবাজার সম্ভবতঃ মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের সমৃদ্ধ বন্দরের স্মৃতি বহন করে। মধ্যযুগের বহু পুঁথিপত্রে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত নানা অংশের উল্লেখ দেখা যায়। এর মধ্যে পড়ে উপবঙ্গ বা যশোর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, হরিকেল অথবা

সিলেট, চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ, পুণ্ড্রবর্ধন বা বগুড়া-দিনাজপুর-রাজশাহী এলাকা এবং বাঙ্গাল বা দক্ষিণ রাঢ় ও ভাগীরথীর সংশ্লিষ্ট এলাকা। ভাগীরথী সম্ভবতঃ দুই অঞ্চলের সীমানায়। এই ভূখণ্ডই পরে বাংলা নামে খ্যাত।

একাদশ শতাব্দী থেকে বাঙ্গাল নামে পরিচিত এই সমগ্র ভূখণ্ডটি, পাঠান রাজত্ব-কালে একটা কেন্দ্রীভূত শাসনের অন্তর্গত হয়। মোগল রাজত্বের সময় এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সীমানা আরও প্রসারিত হয়। কার্যতঃ আইন-এ-আকবরীতে উল্লেখিত সুবে বাঙ্গলা, ব্রিটিশ আমলের 'বেঙ্গল' অভিহিত প্রশাসনিক বিকাশের চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত। 1854 সালে, লর্ড ডালহাউসি যখন বড়লাট ছিলেন, নবগঠিত প্রদেশ বাংলার মধ্যে এখনকার বিহার, উড়িষ্যা, এবং কাছাড় ও শ্রীহট্ট সহ সুরমা উপত্যকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আসামকে আলাদা করা হয় 1874 সালে, বিহার ও উড়িষ্যাকে 1901 সালে। পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে 1905 সালে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। পরিণামে শুরু হয় দেশভাগবিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন। শেষপর্যন্ত দেশভাগ নাকচ করা হয় 1912 সালে। বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক সীমানা, স্বাধীনতার পরে ভারতের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের ভাগাভাগি না হওয়া পর্যন্ত, অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ববাংলা নামে অভিহিত হয়, ও অবশেষে, পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশের জন্ম হয় 1971-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পরে। এক নবজাত স্বাধীন রাষ্ট্র তার সুদীর্ঘ, প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বন্ধনের ছিন্ন সূত্রগুলিকে আবার একে একে গেঁথে নেয়।

যা থেকে বাংলাদেশের নাম হল, সেই 'বাঙ্গাল' কথাটা নাকি দুটো কথা দিয়ে তৈরী, 'বঙ্গ' আর 'আল'। আল শুধু দুই খণ্ড কর্ষিত জমির মাঝখানে উঁচু মাটির সীমানা নয়, বন্যার কবল থেকে জমি বাঁচানোর জন্য যে মাটির বাঁধ তোলা হয়, সেটাও। সদা গতি-পরিবর্তনশীল নদীতে ভরা, ও দুর্মদ বর্ষার প্রকোপে জর্জরিত এই দেশে এ বাঁধ সর্বত্র ছড়ানো।

জাতিবিজ্ঞানের বিচার অনুসারে, বাংলাদেশীর মধ্যে বহু জাতির সংমিশ্রণ আছে। ইতিহাসপূর্ব যুগে 'অস্ট্রিক' বা 'অস্ট্রো-এশিয়ান'রা প্রথম এই অঞ্চলে বসবাস করতে আসে, তারপর ইতিহাসের বিভিন্ন কালে আসে দ্রাবিড়, তিব্বতী-বর্মী, আর্য ও মঙ্গোলীয়। বৈদিক আর্যগণ বাংলাদেশের মানুষের উল্লেখ করেছেন 'ব্রাত্য' বা মিশ্রিত জাতি বলে। দক্ষিণের উপকূলবর্তী স্থানে আরব রক্তের লক্ষণ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে আসে তুর্কী, পাঠান ও আফগানেরা। প্রত্যেকেই তাদের

বিশেষ ছাপ রেখে গেছে সেখানকার মানুষের চেহারার মধ্যে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের এই জাতিগত বিশেষত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নিকটতম প্রতিবেশী উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জাতিভুক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের প্রচুর মিল আছে।

প্রবলা পদ্মাকে অতিক্রম ক'রে, পশ্চিম দেশ থেকে যে বিভিন্ন মানবধারা এসে এ-ভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা এদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে দিয়েছেও অনেক কিছু। আবার সেই সঙ্গে মহতী পদ্মা বহুকাল ধরে বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথরোধ করেছে। যারা এসেছে, তাদের হয় থেকে যেতে হয়েছে, অথবা বর্ষা নামার আগেই প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে। রাশিয়াতে 'জেনারেল বরফ'-এর মত বাংলাদেশে 'জেনারেল বর্ষা', শক্তিতে কম হলেও, শত্রুসৈন্যের যে কী সর্বনাশ করতে পারে, তা সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানী সৈন্য অনেক দাম দিয়ে বুঝেছে। এই কারণে বহু নিপীড়িত ধর্মসম্প্রদায় ও গোষ্ঠী, পদ্মার ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে কিছুটা নিরাপত্তা থাকার দরুণ বাংলাদেশীরা তাদের প্রাচীন রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক চরিত্রের অনেকখানিই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে ও সেইসঙ্গে বহিরাগত মানুষের অনুদানকে আত্মস্থ করেছে। জাতি হিসাবে তাদের উৎকর্ষের এটা একটা বড় কারণ। এই কারণেই, প্রতিবেশীদের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রচুর মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের চরিত্র অনন্য। □



দুই

বাংলার উপকূলে

চৈত্রী বাতাসে
ধুলো ওড়ে রাস্তায় হয়তো বা
বুড়ো বট হাওয়ায় হাওয়ায়
বিভীষিকা হাঁক দেয় কালবৈশাখে।
কানাই জলার মাঠে এখনো শালুক
অথবা চড়ুইভাতি উৎসব বালকের,
হাওয়ায় হেনার গন্ধ
বুকে মাখা
মায়ের বাপের দেশ, প্রপিতামহেরও......

—হায়াৎ মামুদ

144,000 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বাংলাদেশ। ভৌগোলিকভাবে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য, পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা, এই তিন মহতী নদীর সমন্বয়ে তৈরী এক সুবিস্তৃত পলিমাটির সমতলভূমি। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের তেরাই অঞ্চল থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। এই সমতলভূমির বুকে জলের জাল বুনেছে এই তিন মহানদীর শাখাপ্রশাখা ও অনেকগুলি ছোট ছোট স্রোতস্বিনী। তাদের নামগুলি বেশ শ্রুতিমধুর। যেমন, উত্তরে তিস্তা, মহানন্দা, করতোয়া, দক্ষিণে কপোতাক্ষী, ভৈরব, মধুমতী, দক্ষিণ-পূর্বে কর্ণফুলী, আর পূর্বে গোমতী, খোয়াই, সুরমা।

এই অসংখ্য নদী, নালা, খাল দিয়ে তৈরী হয়েছে বহু বিস্তীর্ণ জলাভূমি, যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'হাওর', তৈরী হয়েছে বিল বা হ্রদ। দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমিতে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার সমন্বয়ে সুবিস্তীর্ণ জলরাশি সঞ্চিত হয়েছে। সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। অসংখ্য ছোটো নদীতে ভরা এই

ব-দ্বীপের সমুদ্রাভিমুখ সীমান্তে আছে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'-এর বাসভূমি বিখ্যাত সুন্দরবন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একমাত্র প্রশস্ত পার্বত্যভূমি। ব্রহ্মদেশের আরাকান ইয়োমার বিস্তৃতি, সবুজ অরণ্যখচিত এই পাহাড়গুলি যেন বঙ্গোপসাগরের পান্নার মত ঝলমলে নীল জলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সারির পরে সারিতে সমাকীর্ণ। এখানকার সর্বোচ্চ শিখর, কুকরাডং প্রায় 1230 মিটার উঁচু।

এছাড়া প্রায় 644 কিলোমিটার ধরে আছে আঁকাবাঁকা উপকূলবর্তী এলাকা। এই অঞ্চল ছোট ছোট দ্বীপে ভরা। সমুদ্রতীরের খুব কাছেও কয়েকটি দ্বীপ আছে। ব-দ্বীপের ভিতর দিয়ে যে নদীগুলি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তাদের আর অবস্থা থাকেনা গ্রীষ্মে হিমালয়ের বরফগলা জল বয়ে নেবার। উঁচু স্তর থেকে পলিমাটি ভেসে এসে নদীগর্ভের তলাটাকে উঁচু করে দেয়। উন্মত্ত বর্ষা—বছরে গড়গড়তা 160 থেকে 350 সেণ্টিমিটার—নদীকে আরও ভরিয়ে তুলে সর্বনাশা বন্যা ডেকে আনে। তাছাড়া ফুলে ফেঁপে ওঠা নদী তার গতি বদলায়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে ঘন ঘন বান আসে, ও নদীগর্ভে কিছুটা পলিমাটি জমে। সবশেষে, প্রতিবছর আবির্ভাব হয় প্রলয়ংকর ঘূর্ণীঝড়ের।

1974 সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল আট কোটি। পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনাকীর্ণ দেশ। শুধু ভূমির পরিমাপ দিয়ে বিচার করলে, লোকসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 1200 জন। লোকসংখ্যার শতকরা আশি জন মুসলমান ; বাকীরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও প্রকৃতিপ্রাণ-পূজারী উপজাতি। উপজাতীয়রা প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে। দিনাজপুর ও রাজশাহী থেকে শুরু করে, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের ভিতর দিয়ে এ অঞ্চল অবিচ্ছিন্নভাবে চলে গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিতর অবধি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশে একমাত্র উপজাতিপ্রধান জেলা। এই অঞ্চলে প্রায় বারো রকম বিভিন্ন উপজাতি বাস করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্বাধীনচেতা চাকমা এবং মগ, রান্নায় যাদের প্রচুর খ্যাতি। এছাড়া আছে মুরাং, শেন্দু, পাংখো, তাংচাংগিয়া, তিপরা, কুকী, লুশাই ও বনযোগী। এদের মধ্যে কিছু উপজাতিকে ভারতেও দেখা যায়। ময়মনসিং ও টাঙ্গাইলের উত্তরসীমান্তের সমস্তটা জুড়ে ও শ্রীহট্টের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, গারো, হাজং, দলুই, হোড়ি, বুনা, খাসি ও মণিপুরীদের বসতি আছে। ওরাওঁ, সাঁওতাল, রাজবংশী, হো এবং মুণ্ডাদের বসতি রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চলের সমতল-

ভূমিতে। এই উপজাতীয়দের সবাই তাদের জীবনধারার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। সীমান্তের ওপারে ভারতে তাদের জাতভাইদের একই ঐতিহ্য। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে এদের অবদান বড় কম নয়।

বাংলাদেশে শতকরা 90 জন লোক গ্রামে বাস করে। প্রায় তিন কোটি সামগ্রিক শ্রমজীবীর মধ্যে অন্ততঃ দুই কোটি নিযুক্ত কৃষিকাজে। কৃষকের পরিবারের সংখ্যা প্রায় 90 লক্ষ। এদের মধ্যে 30 লক্ষের উপরে কৃষক ভূমিহীন ও চার লক্ষের কিছু বেশী জনপ্রতি এক হেক্টারের কম জমির অধিকারী। মাত্র 30 হাজার কৃষক দশ হেক্টার বা তার বেশী জমি ভোগ করে। এগুলি সমগ্র কর্ষিত এলাকার শতকরা 34 ভাগ। চাষের উপযুক্ত জমি এক কোটি হেক্টারের অল্প কিছু উপরে। এর মধ্যে শতকরা 83 ভাগ চাষ করা হচ্ছে। মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র 0.12 হেক্টার ও প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটার অন্ততঃ 916 জন মানুষকে প্রতিপালন করে।

শতকরা 25 ভাগ জমি সমতল, উর্বর পলিমাটিযুক্ত সমভূমি। মাটি অতি উর্বর হওয়া সত্ত্বেও, উৎপাদন হেক্টার প্রতি প্রায় 1.2 টন। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। এর কারণ অংশতঃ খামখেয়ালী আবহাওয়া, উৎপাদনে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনের অভাব ও পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিসম্পর্ক। সমস্ত কর্ষিত ভূমির শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ জলসেচ পায়। প্রধান শস্য ধান। এর উৎপাদন 95 লক্ষ হেক্টার জুড়ে, অথবা অন্যান্য বড় উৎপাদনের সমগ্র এলাকার শতকরা 70 ভাগে। গম ফলে প্রায় 160,000 হেক্টার জমিতে, পাট 800,000, তামাক 47,000 ও আখ 152,000 হেক্টার জমিতে। সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী পাট উৎপাদন করে। চা-বাগান আছে 151টি, বেশীর ভাগই শ্রীহট্টে। রবারের জন্যও অল্প কিছু জমি আছে। বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন প্রচুর, যেমন আম, কলা, আনারস, তরমুজ, নারকোল, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি।

বাংলাদেশের 22 লক্ষ হেক্টার জুড়ে জঙ্গল। সারা দেশের আয়তনের শতকরা 16.12 ভাগ এর এলাকা। সবচেয়ে বিস্তৃত জঙ্গল সুন্দরবন, যার এলাকা প্রায় 600,000 হেক্টার। সদা সবুজে ভরা, বর্ষণমুখর বনাঞ্চল, ভারতের সুন্দরবনের প্রসারণ। সমুদ্রের খাঁড়ি, ছোট নদী, খাল বিল ও জলাজমি এর অলংকার। সুপরিচিত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ছাড়াও এর বুকে বাস করে অজস্র কুমীর, চিত্রিত হরিণ, বাঁদর, ময়াল ও গ্রীষ্মমণ্ডলের পক্ষীকুল। অন্যান্য জঙ্গলের মধ্যে, ময়মনসিং-এর মধুপুর। টাঙ্গাইল ও ভাওয়াল থেকে দক্ষিণে ঢাকার কাছাকাছি পর্যন্ত এর পরিধি। জঙ্গল থেকে বছরে 4 লক্ষ টন কাঠ ও 12 লক্ষ টন জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত হয়।

বাংলাদেশে খনিজ উৎপাদন অতি সীমিত। দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের শেষ প্রান্তে পাহাড়ী অঞ্চলে তা সীমাবদ্ধ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। সঞ্চিত গ্যাসের হিসাব করা হয়েছে 250 কোটি ঘন মিটার, সাতটি ক্ষেত্র জুড়ে যার বিস্তৃতি। এই গ্যাস গৃহস্থ সংসারে ও কলকারখানাতে জ্বালানী সরবরাহ করতে তো পারেই, সার তৈরীর কারখানাও চালু রাখতে পারে।

জামালপুরে প্রায় 100 কোটি টন উচ্চমানের কয়লার খোঁজ পাওয়া গেছে, কিন্তু প্রায় 900 মিটার গভীরে, প্রায়োগিক দিক থেকে তা উদ্ধার করতে যাওয়া প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। কিছু কিছু এলাকায় অবশ্য জলাজমির উদ্ভিজ্জ কয়লার যোগাড় আছে। পাথুরে চুণ আটটি বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে, কিন্তু তা সিমেণ্ট শিল্পের প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট নয়। এছাড়া আছে চীনামাটি ও স্ফটিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাওয়া লোহার সামান্য রসদ টেনে তোলা অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর নয়। তেজস্ক্রিয় ধাতব পদার্থের দাম ধার্য হয়েছে 60 লক্ষ ডলার।

প্রশাসনিকভাবে বাংলাদেশকে উনিশটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে: ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ময়মনসিং, টাঙ্গাইল, শ্রীহট্ট, পাবনা, কুষ্টিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর: 15 লক্ষ লোকসংখ্যার ঢাকা, 436,000 লোকসংখ্যার খুলনা, এবং 242,000 লোকসংখ্যার চট্টগ্রাম (1974)। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল আর্দ্র, শীতকাল মোটামুটি ঠাণ্ডা ও বর্ষা প্রবল বর্ষণবহুল। সবচেয়ে উপভোগ্য ঋতু শীতকাল। বাংলাদেশ অবশ্য সবচেয়ে সুন্দর বর্ষাকালে। ঘনায়মান কালো জলভরা মেঘ, মাটির ভরা সবুজের সঙ্গে এক আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য রচনা করে। থৈ থৈ জলে চওড়া নদীর কূল ভেসে যায়। বর্ষা মানুষের দুর্ভাগ্যও ডেকে আনে। নদীবহুল দেশের প্রধান যানবাহন নৌকা ও স্টীমার। ফুলে ফেঁপে ওঠা নদীর উত্তাল ঢেউয়ের দোলায় অতিরিক্ত সংখ্যায় যাত্রীভরা এই হালকা যানবাহনগুলি প্রায়ই উল্টে গিয়ে বহু প্রাণহানি ঘটায়।

বহিরাগত দর্শকদের আকর্ষণ করার মত বাংলাদেশে অনেক কিছু মনোজ্ঞ উপকরণ আছে: প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, প্রাচীন ও নবীন স্মৃতিসৌধ, মনোরম সমুদ্রতীর, ও প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্তু জানোয়ার ও পাখী।

রাজধানী শহর ঢাকা, 1608 খ্রীস্টাব্দে সুবে বাংলার মোগল রাজপ্রতিনিধিদের শাসনকেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত হয়। এই সময় থেকে শহর গড়ে তোলার যে কাজ শুরু হয়, তার চিহ্ন আজও অটুট। 1678 সালে লালবাগ কেল্লা গড়েন ঔরংজেবের পুত্র

মহম্মদ আজম শা। নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবির কবরস্থান এখানে। লালবাগ ছাড়াও আছে বহুসংখ্যক সুদৃশ্য মসজিদ, সাত মসজিদ যার অন্যতম। সাতটি গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি নির্মিত হয় 1680 খ্রীস্টাব্দে।

ঢাকাতে নূতন ও পুরাতনের স্থান খুব কাছাকাছি। শহরের কেন্দ্রস্থলে পাকিস্তানীরা মক্কার পবিত্র কা'বার অনুসরণে এক বৃহদায়তন মহিমময় মসজিদ নির্মাণ করেছে। আয়ুব রাজত্বে নির্মিত নতুন রাজধানী স্থপতিবিদ্যার এক আধুনিকতম নিদর্শন। আশপাশের শিল্পাঞ্চলগুলি, যথা নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, টঙ্গী ও তেজগাঁও সহ ঢাকা একটা বর্ধিষ্ণু শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে আছে বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি, একটি ছোট জাদুঘর, বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা, প্রধান সংবাদপত্রগুলির অফিস ও একটিমাত্র দূরদর্শনকেন্দ্র (1978)। বহু-প্রসারিত বেতার কেন্দ্রগুলির প্রধান দপ্তরও ঢাকায়।

ঢাকা থেকে 23 কিলোমিটার দূরে সোনারগাঁও ; দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশের রাজধানী। সেখানে আছে প্রাচীন স্মৃতিসৌধের প্রাচুর্য—ভগ্ন সৌধ, ভাস্কর্য, মসজিদ, কবরস্থান। একটি হস্তশিল্পকেন্দ্র ও একটি জাদুঘর সেখানে স্থাপন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর চট্টগ্রাম। কর্ণফুলী নদীর তীরে এটি একটি কর্মব্যস্ত আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর। পাহাড়ের পটভূমিতে চট্টগ্রামকে এক অপরূপ ছবির মত মনে হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'কুহেলি আর জল থেকে উত্থিতা ঘুমন্ত সুন্দরী।' যদিও অনেকটা পরিবর্ধিত ও আধুনিকীকৃত, চট্টগ্রাম সেই পুরোন চরিত্রের এখনও কিছুটা বাঁচিয়ে রেখেছে। এখানেও বেশ কিছু মসজিদ আছে—চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত, যেমন কাদ্দম মুবারক মসজিদ ও চিল্লা বদর শা। চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নত অঞ্চল এটি। এখানে আরও আছে মোটরগাড়ী, সার, পূর্তবিদ্যা, রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, কাঠ ও চামড়া পাকা করার কলকারখানা। দেশের একমাত্র ইস্পাত কারখানা ও তৈল শোধনাগারও এখানেই।

চট্টগ্রাম থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে সীতাকুণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ, হিন্দু ও বৌদ্ধদের তীর্থস্থান। জনশ্রুতি যে, এখানকার বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধের পায়ের ছাপ আছে। চট্টগ্রামের 153 কিলোমিটার দক্ষিণে কক্সবাজার, ছুটি কাটানোর জায়গা। এখানে বেলাভূমি পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম, 121 কিলোমিটার। 97 কিলোমিটার ধরে এর সমান্তরাল সবুজ পাহাড়ের সারি সমুদ্রের পটভূমি রচনা করেছে আঁকা ছবির মত। আর একটি মনোহর জায়গা কাপ্তাই, চট্টগ্রাম থেকে 64 কিলোমিটার

দূরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক ঘন জঙ্গলকে রূপান্তরিত করা হয়েছে 687 স্কোয়ার কিলোমিটারব্যাপী জলাশয়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কর্ণফুলী নদীতে নির্মিত একটি বাঁধের ফলে এই অপূর্ব সুন্দর কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি। ঘন সবুজ অরণ্যে ঘেরা, ছোট খণ্ডদ্বীপে ভরা। এই হ্রদের বুকে মোটরবোটে ভ্রমণ এক পরম উপভোগ্য অভিজ্ঞতা।

ঢাকা থেকে 97 কিলোমিটার দূরে কুমিল্লা। গ্রামোন্নয়ন আকাদমীর জন্য খ্যাত। বাংলাদেশের গ্রাম সমবায় সমিতি আন্দোলনের পুরোধা। সপ্তম শতাব্দীর এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের পাশেই এর অবস্থিতি। নীচু পাহাড়ের ঢালু গায়ে, ময়নামতী-লালমাই গিরিপথের উপরে দ্বাদশ শতাব্দী ব্যাপী প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বহু ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো। বহু স্তূপ ও একটি বিরাট মঠের ধ্বংসাবশেষ সহ প্রচুর নির্মাণকার্যের এখানে সমারোহ। যশ ও গৌরবের দিনে কেন্দ্রীয় দেবালয়ের আকৃতি নিশ্চয় মহিমান্বিত ছিল।

শ্রীহট্ট বাংলাদেশের চা-উৎপাদন অঞ্চল। ঢালু পাহাড়ের গড়ানো চত্বরে, মখমল-সবুজ চায়ের ঝোপগুলিকে বড় সুন্দর দেখায়। চা-বাগানের মর্মস্থলে শ্রীমঙ্গলে একটি চা-গবেষণাকেন্দ্র আছে। চা ছাড়া শ্রীহট্টে অন্যান্য বড় শিল্প সিমেণ্ট ও কাগজ। এখানেও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্য। লোভনীয় বাঁশের তৈরী জিনিস ও হাতে বোনা রংদার মণিপুরী কাপড় পাওয়া যায়। শ্রীহট্টে আনারস ও কমলালেবু ফলে। শীতকালে লক্ষ লক্ষ দেশান্তরী পাখী এখানে বাসা খোঁজে।

পৃথিবীর সূক্ষ্মতম পাটের উৎপাদন হয় ময়মনসিং-এ। পাটের দিনে সারা রাস্তা জুড়ে ভিজে পাট শুকোতে দেওয়া হয়। রাস্তার ধারে দেখা যায়, পুরুষ ও মেয়েরা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে পাটের আঁশ পরিষ্কার করছে। বছরের শেষ দিকে দেখা যায়, গাঁয়ের মেলাগুলো বস্তা বস্তা সোনালী পাটে ভরে গেছে। ময়মনসিং উঁচুদরের চাল ও নোনতা, কিছুটা কষা স্বাদের পনীর তৈরী করে। দেশের একমাত্র কৃষি-বিদ্যালয় এখানে। সমৃদ্ধ লোকগাথার জন্মস্থান ময়মনসিং।

বগুড়া উন্নয়নশীল শিল্পকেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি চিনি, কাপড় ও রসায়নের কারখানা গড়ে উঠেছে। এর তাঁতবস্ত্রের চাহিদা সারা দেশে। নিকটেই, করতোয়া নদীর পারে শায়িত মহাস্থানগড়, বাংলাদেশের আদি রাজধানী। এই ধ্বংসস্তূপের প্রতিটি পাথরের এক নিজস্ব ইতিহাস আছে, যদিও তা এখনও ভূগর্ভনিহিত। এখানে আছে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক এক সভ্যতার অবশিষ্ট। যে ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদালের দাগ পড়েনি।

রাজশাহী আর এক বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শহর। বারেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর নামে এখানেও একটি সমৃদ্ধ জাদুঘর ও গবেষণাকেন্দ্র আছে। আম, লিচু ও রেশমী কাপড়ের জন্য এই জেলা বিখ্যাত। রাজশাহীতে রেশমের গুটিপোকা চাষ করার সংস্থা আছে। এই জেলায়, হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত বৃহত্তম বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। পাহাড়ের মত উচ্চতার দরুণ এর নাম পাহাড়পুর। আসল মঠের চারিধারে সর্বত্র সন্ন্যাসীদের গুহাকক্ষের ভগ্নাবশেষ। বহির্দেয়ালগুলিতে অপূর্ব সুন্দর পোড়ামাটির ফলক আঁটা। অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশের রাজত্বে প্রজাদের জীবনধারা সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায় এগুলি থেকে।

বাংলাদেশের একেবারে উত্তরে দিনাজপুর জেলা। এখানে উঁচুদরের আখ ও তামাকের চাষ হয়। দিনাজপুর শহরের কাছে কান্তানগরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের হিন্দুমন্দির আছে। মন্দিরের দেয়ালে বাংলাদেশী পোড়ামাটির কাজের সূক্ষ্মতম শিল্পনিদর্শন পাওয়া যায়। এর প্রতিপাদ্য বিষয় রামায়ণ ও মহাভারতের দৃশ্যাবলী।

ঢাকার 322 কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলনা, দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পপ্রধান শহর। এটি একটি সমৃদ্ধ অন্তর্দেশীয় বন্দর। এখানে একটি সুসজ্জিত জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কেন্দ্র আছে, ঠাণ্ডা গুদামঘর, টেলিফোন তারের কারখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ও নিউজপ্রিন্ট তৈরীর কারখানা আছে। খুলনা থেকে 32 কিলোমিটার দূরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন খান জাহান আলির ষাট গম্বুজওয়ালা মসজিদ আছে। সুন্দরবনের উঁচু অংশে অবস্থিত, দেশের দ্বিতীয় বন্দর চালনাতে পৌঁছবার প্রবেশদ্বার খুলনা।

এই হল বাংলাদেশ...বিচিত্র সৌন্দর্যে ভরা। আন্তরিক ও অতিথিবৎসল এর মানুষ, নদীর মত প্রাণোচ্ছল, নদীর মতই কখনও স্থির, শান্ত, কখনও সহসা বিদ্রোহে উত্তাল, প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির গর্বে গর্বিত। □

তিন

অগণিত রাজত্ব

বক্ষে তার কত লক্ষ সভ্যতার স্মৃতি গেছে দহি ;
কত শৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সীমা
প্রেম-পুণ্য-পূজার গরিমা
অকলঙ্ক সৌন্দর্য্যের বিভা
গৌরবের দিবা ।

—জীবনানন্দ দাশ

বাংলাদেশের একটা নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসকে পুনর্যোজন করার কোন প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত হয়নি। কাজটা কঠিন। ভারতীয় ও বিদেশী বইতে প্রাচীনতম যুগ সম্পর্কে শুধু খণ্ডিত সংবাদ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ থেকে জ্ঞানসম্পদ আহরণ করা সম্ভব ছিল, কিন্তু এপর্যন্ত তাতে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়নি। খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে খ্রীস্টপরবর্তী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বংলাদেশের পশ্চিম ও উত্তরাংশের ইতিহাস সঞ্চিত আছে বগুড়ার কাছে মহাস্থানগড়ে। কিন্তু এই জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা খোলার কোন চেষ্টাই প্রায় হয়নি। নিঃসন্দেহ, বাংলাদেশের ইতিহাসে এত ফাঁক আছে, যা একমাত্র পণ্ডিতেরাই পূরণ করতে পারেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কীদের আগমনের পর, কিছু ঐতিহাসিক দলিল লিখিত হয়। তবুও ফাঁক থেকে গেছে, কারণ বাংলাদেশের ইতিহাস উপমহাদেশের বাকী অংশের সঙ্গে এমনভাবে জড়ানো, যে সে-গিঁট ছাড়ানো সহজ কথা নয়। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসনের যুগ সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে, যদিও তার বিশদ দলিল পাওয়া যায়।

মনে হয়, খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে আর্যপ্রভাব বাংলাদেশে পৌঁছয়নি। বঙ্গ—যাকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপারে অবস্থিত অঞ্চলের সঙ্গে একীভূত করা হয়—তার

কোন উল্লেখ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আর্যদের সঙ্গে এই অঞ্চল-বাসী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উপজাতির প্রথম যোগাযোগ স্পষ্টতঃই খুব মধুর হয়নি। 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় এক পাখী হিসেবে, সম্ভবতঃ 'টোটেম' বা কোন উপজাতির প্রতীক হিসেবে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পুণ্ড্রদের সমাজবহির্ভূত উপজাতি বলে বর্ণনা করেন। তাদের বগুড়া-রংপুর অঞ্চলে পুণ্ড্রবর্ধনের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বঙ্গে এক দস্যুসম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন। আর্যগণ তাদের ভাষা ও আচারব্যবহারকে বর্বরসুলভ জ্ঞান করতেন। এটা পরিষ্কার, যে সুপরিসর নদীগুলি বাংলাদেশবাসীদের বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার কাজ করত। সেইসঙ্গে এই বিশাল উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলবাসীদের কাছ থেকে তাদের বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

দুঃসাহসিক পর্যটকদের অবশ্য ঠেকিয়ে রাখা যেতনা। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এখানে সর্বপ্রথম আগন্তুক অতিথি হলেন রামায়ণখ্যাত বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ। তিতিক্ষু নামে রাজা দ্বারা স্থাপিত 'পূর্বদেশের রাজত্বের' অনব-শাসকগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর এক বংশধর বালি। তাঁর অনুরোধে ঋষি দীর্ঘতামস মামাত্য ও বালিপত্নী রানী সুদেষ্ণা পাঁচটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই পাঁচ বংশধরগণ পাঁচটি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে সারা পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে দুই উপজাতির নাম বঙ্গ এবং পুণ্ড্র।

এ সবের উল্লেখ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পুঁথিতে পাওয়া যায়। অতএব এটা ধরে নেওয়া যায় যে, লিখিত ইতিহাসে বাংলাদেশের উদ্ভবের সময়ে, আদিম, গোষ্ঠীতান্ত্রিক উপজাতীয় সমাজগুলির স্থান নিয়েছিল ছোট ছোট রাজত্ব। আর্যদের সঙ্গে যোগা-যোগাযোগের ফলে, তুমুল সংঘাত ও বিবাহসূত্রে মৈত্রী, এই দুই রকম অবস্থাই দেখা যায়, এমনকি শাসকশ্রেণীর মধ্যেও। অযোধ্যা ও বঙ্গের রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবংশীয় বাসুদেবের কীর্তিকথার প্রচুর উল্লেখ মহাভারতে আছে। জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী পাণ্ডব-শিবিরে প্রভূত চিন্তার কারণ হয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধন ও বঙ্গ উভয়কেই প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পে সমৃদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের শাসকরা হাতীর পিঠে মুক্তো ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি চড়িয়ে দুর্যোধনের রাজসভায় এসেছিলেন।

মহাস্থানগড়ে পাওয়া ভগ্নাবশেষ থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চল খ্রীস্টোত্তর তৃতীয়

শতাব্দীতে মৌর্য শাসনের অন্তর্গত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সম্ভবতঃ পাঁচটি বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভব হয় : বারেন্দ্রী, বঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন হরিকেল ও সমতট। বিভিন্ন মহারথী, রাজবংশ ও রাজত্বের উত্থানপতন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এদের উল্লেখ বার বার আসে। এই অঞ্চলকে নির্দিষ্ট ও পরিষ্কারভাবে স্থিরীকৃত করা সবসময়ে সম্ভব নয়। গঙ্গার পূর্বপারে ও পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম প্রতিবেশী বারেন্দ্রীকে সাধারণভাবে রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর অঞ্চলের সঙ্গে একীভূত করা হয়। বঙ্গ সম্ভবতঃ ছিল মধ্য বাংলাদেশে, তথা ঢাকা-ময়মনসিং অঞ্চলে। পরবর্তী যুগে সমস্ত এলাকাটিই বঙ্গ নাম গ্রহণ করে যা পরে বাঙ্গলা নামে খ্যাত। তারও পরে পশ্চিম-বঙ্গও এর অন্তর্গত হয়। বগুড়া-দিনাজপুর এলাকা নিয়ে তৈরী পুণ্ড্রবর্ধনকে সম্ভবতঃ উত্তর বাংলাদেশ বলা যায়। শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-কুমিল্লা দিয়ে তৈরী পূর্ব অংশের নাম ছিল হরিকেল। চট্টগ্রাম-খুলনা-যশোর এলাকা নিয়ে দক্ষিণে সমতট পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মৌর্যদের সময় থেকে, বহু রাজবংশ, বিভিন্ন যুগে এবং এই বহুবিস্তৃত উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে সমগ্র দেশের উপরে একটা কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তাদের সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সেই সব সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সাফল্য অর্জন করল ইংরেজরা। তারাও যখন যেতে বাধ্য হল, তখন যাবার সময় দেশবিভাগের আকারে রেখে গেল ভাঙা টুকরোগুলো।

সারা ইতিহাস জুড়ে, মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য ছাড়া, যারাই সেখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে এসেছে, বাংলাদেশ তাদের সে কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। অল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে এসেছে বটে, কিন্তু ঘন ঘন বিদ্রোহ হয়েছে, অনেক সময়েই পূর্ণ স্বাধীনতা বা কার্যতঃ স্বাধীনতার অবস্থায় পৌঁছেচে। অষ্টম খ্রীস্টাব্দ থেকে অবশ্য বাংলাদেশের ভাগ্য তার পশ্চিমী প্রতিবেশীর ভাগ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায়। একাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি দুই দেশের মধ্যে একই ভাষা গড়ে ওঠে, সে-ভাষা—বাংলা ভাষা। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে, বিভিন্ন যেসব জায়গা বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল, তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মোগলদের অধীনে, বাংলাদেশ সুবে বাংলার একাংশে পরিণত হয়।

চতুর্থ শতাব্দীতে, সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বাংলাদেশের সীমান্ত অবধি বিস্তৃত হয়। সে-অঞ্চলের গোষ্ঠীপতিরা কর দেবার অধীনতা স্বীকার করে আক্রমণ প্রতিহত

করলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন সে-অঞ্চলকে আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করতে চাইলেন, তখন কঠিন বাধার সম্মুখীন হলেন। গোষ্ঠীপতিদের একটা দল গড়ে উঠল, গুপ্ত সাম্রাজ্যে এই প্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা উড়ল। একটা অর্ধ-স্বাধীনতার অবস্থা বজায় রইল। 506 শতাব্দীতে বাণিয়গুপ্ত নামে সম্ভবতঃ গুপ্তরাজবংশের এক বংশধর, বঙ্গের স্বাধীন শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। পরবর্তী বৎসরে গোপচন্দ্র তাঁকে গদীচ্যুত করলেন। বাংলাদেশ অঞ্চলের উপরে সার্বভৌম গুপ্ত প্রভুত্বের এখানেই সমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন তাম্রলিপি অনুসারে গোপচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 575 শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করেছিল। ধর্মাদিত্য গোপচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। ধর্মাদিত্যের পরে সিংহাসনে বসলেন তদীয় পুত্র সমাচার দেব। সম্ভবতঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অংশ পর্যন্ত তাঁদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল, এ ছাড়া এই রাজাদের সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে পৃথুবীর ও সুধন্যাদিত্য নামে অন্য দুইজন শাসকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় মুদ্রা ও পদকের মাধ্যমে।

সপ্তম শতাব্দীতে পশ্চিমদিক থেকে শশাঙ্ক এসে বাংলাদেশের অধিকাংশ নিজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করলেন। পুণ্ড্রর উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর একটি রাজধানী হিসাবে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনোত্তর অরাজক অবস্থার পরে তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে কিছু লিখিত দলিল পাওয়া যায়। মধ্যযুগের এক বৌদ্ধ বিবরণী 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প'-র মতানুসারে, হর্ষবর্ধন পুণ্ড্র আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু পদ্মার উত্তরে ও ভাগীরথীর পূর্বে কোন অঞ্চলের উপরে দখল বজায় রাখতে পারেন নি। এই বিবরণ হিউয়েন সাংও—যিনি এই এলাকায় প্রচুর ঘুরেছেন,—মোটামুটি সমর্থন করেন। বাংলা অঞ্চলের পাঁচটি স্বাধীন রাজত্বের নামের মধ্যে তিনি পুণ্ড্রবর্ধন ও সমতটের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বঙ্গ ও সমতট ব্রাহ্মণ রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। তাঁর সমকালীন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ রাজপরিবারভুক্ত।

খড়্গরা এই রাজাদের গদীচ্যুত করে। তারা বোধহয় তিব্বত থেকে আক্রমণ করেছিল। খড়্গরা ছিল বৌদ্ধ। আবার কনৌজের যশোবর্মণেরও নাম শোনা যায়। ইনি বাংলাদেশের কিছু অংশের উপরে রাজত্ব বিস্তার করেন। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক বিবরণী 'রাজতরঙ্গিণী'তে কাশ্মীর অধিপতি ললিতাদিত্যের পৌত্র রাজকুমার জয়পদর পুণ্ড্রবর্ধনে আগমনের কথার উল্লেখ আছে। জয়পদ, নিজের রাজত্ব হারিয়ে, পুণ্ড্রবর্ধন শাসক জয়ন্তর কন্যাকে বিবাহ করেন। পশ্চিমবঙ্গের গৌড়ের

রাজার কাছে জয়ন্ত বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। জয়পদ গৌড় আক্রমণ করে জয় করেন ও তাঁর শ্বশুরকে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত করেন। এসব ঘটনা ঘটে সম্ভবতঃ সপ্তম খ্রীস্টাব্দের শেষার্ধে এবং অষ্টম খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে।

শশাঙ্ক এক শক্তিশালী ও বহুদূরবিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠন করে গৌড় থেকে শাসনকার্য চালাতেন। মনে হয় তাঁর মৃত্যুর পরে, বাংলাদেশের স্থানীয় গোষ্ঠীপতিরা পুনরায় তাঁদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই অবস্থা অষ্টম শতাব্দীর অর্ধভাগ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় একশ' বছর ধরে চলে। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে যেসব শহর গড়ে উঠেছিল, সেগুলির অবনতি ঘটে। বণিকসমৃদ্ধির প্রারম্ভ এক অরাজক অবস্থার মধ্যে ক্রমশঃ হতশ্রী হয়ে যায়। আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভের এই যুগের শেষের দিকে সমতটের শাসক জয়ধর্ম ও তদীয় পুত্র শ্রীধর্ম, এবং বঙ্গের তৎকালীন শাসক লোকনাথ ও জয়তুঙ্গবর্ষের নাম শোনা যায়।

এর কয়েক বছর পরে, অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, বাংলাদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীপতিরা একযোগে তাঁদের সৈন্যদলকে সংহত করলেন বহিঃশত্রুর পুনরাক্রণকে প্রতিহত করার জন্যে। উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে যে নানাবিধ শাসক-রাজবংশের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁরা ইতিপূর্বেই বাংলাদেশের উপরে নজর দিতে শুরু করেছিলেন। 750 খৃষ্টাব্দে, স্থানীয় গোষ্ঠীপতিরা গোপালকে তাঁদের নেতা নির্বাচন করেন। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে গোপালের জন্ম পুণ্ড্রবর্ধনের কাছাকাছি কোন স্থানে। তিনি ক্ষত্রিয় ও বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বঙ্গে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাঁর বিশ বছরের রাজত্বের মধ্যে, তাঁর রাজ্যসীমান্ত আজকের পশ্চিমবঙ্গকেও অতিক্রম করে যায়।

যে পালসাম্রাজ্য এক সময়ে উত্তর ভারতের অধিকাংশ দেশের উপরে প্রভুত্ব করেছে, এমনকি দক্ষিণেও যার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, তার মহিমার আসল প্রতিষ্ঠাতা হলেন গোপালের পুত্র ধর্মপাল (752-94 খ্রীস্টাব্দ)। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পালসাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার আদি বাসভূমি বাংলাদেশের উপরে নিয়ন্ত্রণ-অধিকার ক্ষুন্ন হতে লাগল। বাংলাদেশে অবিরাম বহিঃশত্রুর আক্রমণ চলছিল। সেইসঙ্গে এর কিছু কিছু অংশ কেন্দ্রীয় শাসক-পরিবারের গণ্ডী থেকে বার বার নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আনছিল। পাল রাজারাও অবশ্য কিছুদিন অন্তর অন্তরই নিজেদের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁদের মগধে নির্বাসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে

হল। নিরবচ্ছিন্ন না হলেও পূর্বভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের রাজত্বের ইতিহাসের ব্যাপ্তি চার শতাব্দী ধরে। তুর্কীদের আক্রমণে সে ইতিহাসের অবসান ঘটে।

ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করার অল্পদিন পরেই উপমহাদেশের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে গুর্জর ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে ত্রিদলীয় লড়াইতে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দুঃসাহসিক সামরিক অভিযানে তিনি যত অগ্রসর হতে লাগলেন, বঙ্গ এবং বাংলাদেশের কিছু অংশের উপরে তাঁর অধিকার ততই শিথিল হতে লাগল। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরা ও রাজস্থানের প্রতিহাররা এই অবস্থার সুযোগ নিল। স্থানীয় গোষ্ঠীপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিভিন্ন এলাকায় তারা সাময়িক অধিকার স্থাপন করল। এদের মধ্যে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ ও তাঁর ছেলে সর্ব ছয় বৎসর বঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। তারপরে রাজ্যভার চলে যায় প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের আয়ত্তে।

ধর্মপালের ছেলে দেবপাল বঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন, ও রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেন। পালসাম্রাজ্য দেবপালের শাসনকালে গরিমার সর্বোচ্চ শীর্ষে পৌঁছয়। তাঁর মৃত্যুর পরে যে অবনতি এল, সেই অবসরে বিভিন্ন স্থানীয় গোষ্ঠীপতিরা আবার তাঁদের স্বাধীনতা কায়েম করলেন। বিদেশী হানাদাররাও কিছুটা হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হল। পুণ্ড্রবর্ধন কিছুদিনের জন্যে প্রতিহার শাসকদের অধিকারে চলে গেল। মাঝে মাঝে অল্পদিনের জন্যে পালরা ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন। প্রথমে নারায়ণ পাল, পরে প্রথম মহীপাল, ও সবশেষে রামপালের রাজত্বকাল সবই একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দশম শতাব্দী, বিক্ষোভ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্যের আবির্ভাবের আর একটা যুগ। পালশাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিব্বতের কম্বোজ রাজারা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করলেন। তাঁরা হরিকেল-এ শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা এলাকাকে অন্তর্গত করে রাজত্ব স্থাপন করলেন। কান্তিদেবের রাজত্ব সম্ভবতঃ বাংলাদেশের কেন্দ্রস্থল পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বর্ধমানপুর—হতে পারে সেটা আজকের বর্ধমান—এই রাজত্বের অংশ ছিল বলে জানা যায়। প্রায় একই সময়ে দক্ষিণে কুমিল্লার ময়নামতী অঞ্চলে, চন্দ্র রাজবংশের উদ্ভব হল। সমতট জয় করে চন্দ্ররা উত্তরে এগিয়ে গেলেন। ত্রৈলোক্য চন্দ্র ও তদীয় পুত্র শ্রীচন্দের রাজত্ব শ্রীহট্টের সীমান্ত থেকে বাখরগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বঙ্গ তার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করতে গিয়ে ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে মধ্যভারতের লক্ষ্মণ রাজার আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়।

1021 খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, বাংলার বুকে চন্দ্র রাজত্বের

অবসান ঘটল। বঙ্গ এবং সমতট মিলে তখন বাঙ্গলা। শেষ চন্দ্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। রাজেন্দ্র চোলা অবশ্য বাঙ্গলার উপরে অধিকার বজায় রাখতে বিফল হলেন। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থাংশে বাঙ্গলা বর্মণ রাজাদের অধীনে চলে যায়। বর্মণ রাজারা তাঁদের পূর্বপুরুষকে যাদব উপজাতিভুক্ত বলতেন। শ্রীকৃষ্ণ এই বংশে জন্মেছিলেন বলে শোনা যায়। বর্মণ রাজারা তাই বহিঃশত্রুর শামিল। জাতবর্মণ সমস্ত বাংলাদেশকে একীভূত করার চেষ্টা করলেন। তিনি দিব্যর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হলেন। দিব্য ছিলেন পালরাজাদের এক কর্মাধ্যক্ষ। ইনি কৈবর্তবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 1075 খ্রীস্টাব্দে বারেন্দ্রীতে নিজের রাজত্ব স্থাপন করেন। বর্মণ রাজাদের দেশজয়ের আয়ু বেশীদিন ছিল না। দিব্যর ছেলে রুদ্রক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করলেন। তাঁর পৌত্র ভীম অবশ্য পরাজিত হলেন রামপালের হাতে। রামপাল হরিবর্মণকেও পাল সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেন। হরিবর্মণের রাজধানী ছিল বঙ্গের বিক্রমপুরে ; মিথিলার নান্যদেবের ক্রমান্বয় আক্রমণে তিনি ইতিপূর্বেই যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছিলেন।

বাংলায় পাল রাজত্বের অবনতির সঙ্গে একটা নতুন রাজবংশের আবির্ভাব হল। কন্নড় বংশীয় সামন্তসেন প্রায় সর্বাংশে স্বাধীন গোষ্ঠীপতি হয়ে গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করলেন। ইনি পালরাজাদের অধীনে কাজ করতেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন, এবং তদীয় পুত্র বিজয় সেন সিংহাসনে আরোহণ করলেন 1095 খ্রীস্টাব্দে। পূর্বভারতে এবার এক নতুন শক্তিধর দেখা দিল—সেন রাজবংশ। বিজয় সেন মদন পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, এবং শেষ অবধি পালদের বাঙ্গলা থেকে বিতাড়িত করলেন। তাঁরা কোন মতে মগধে টিঁকে রইলেন। 1162 খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বিজয় সেন বাংলাদেশে এলেন ও বারেন্দ্রী অধিকার করলেন। পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে তিনি শেষ বর্মণ রাজাকে পরাভূত করেন ও বাংলাদেশকে নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এইভাবে, সমগ্র বাঙ্গলা পুনরায় এক শাসনের অধীনে আসে। তাঁর পূর্বদিকের রাজত্বের জন্যে তিনি বর্মণ-রাজধানী বিক্রমপুরকে বেছে নিলেন, ও গৌড় তাঁর পশ্চিমদিকের রাজধানী রয়ে গেল।

এখন যে-অঞ্চলকে বাংলাদেশ বলা হয়, তার অধিকাংশ এলাকার উপরে সেনরা প্রায় একশ' বছর রাজত্ব করেন। তুর্কীদের বারংবার আক্রমণে তাঁরা স্থানভ্রষ্ট হলেন, ও তুর্কীরা সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করল। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন পূর্বদিকের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলেন সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁওতে। মোগল আক্রমণ ও সুবে বাঙ্গলার সঙ্গে একীভূত হওয়ার আগে পর্যন্ত, বহু শতাব্দী ধরে

সোনার গাঁও পূর্বদিকের রাজধানী ছিল। 1178 খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেনের উত্তরাধিকার ভার গ্রহণ করলেন তদীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসরে উজ্জ্বল সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিকে পালরাজত্বের আসন মগধের মর্মস্থলে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করলেন, অন্যদিকে দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত, ও পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত। রাজধানী নদীয়া থেকে তিনি ভারতের সমগ্র পূর্ব এলাকার শাসনকার্য চালাতেন।

রাজত্বের শেষদিকে লক্ষ্মণসেন প্রমোদপ্রিয় হয়ে পড়েন, ও এই বিশাল দেশের উপরে উপযুক্ত কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। আভ্যন্তরীণ বিরোধ জ্বলে ওঠে। অবশেষে 1199 সালে আসে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণ। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে, বিনাযুদ্ধে তিনি লক্ষ্মণ সেনের পশ্চিম রাজত্বের অধিকারী হলেন। একদা-বিখ্যাত সামরিক নেতা নিঃশব্দে নদীয়া পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। লক্ষণ সেনের উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ সেন। ইতিমধ্যে তুর্কীরা বারেন্দ্রীতে একটা ঘাঁটি তৈরী করে বসতে পেরেছে। এখান থেকে সেনরাজাদের রাজত্বের মর্মস্থল বঙ্গবিজয়ের জন্য তারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। বিশ্বরূপ সেন 1226 সালে তুর্কীদের পরাস্ত করেন, ও পরবর্তীকালে মালিক সৈফুদ্দীনের আক্রমণের প্রচেষ্টাকে রোধ করেন কেশব সেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বঙ্গে সেনবংশের স্থান গ্রহণ করেন কুমিল্লা থেকে আগত দেববংশ। এই বংশের পুরুষত্বানন্দ প্রথম বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন এক গ্রামসর্দার। তাঁর পুত্র মধুসূদন হরিকেলের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীন গোষ্ঠীপতি হন। মধুসূদনের পুত্র বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্র দামোদর হরিকেলের শাসককে উচ্ছেদ করে নিজ শাসন কুমিল্লার উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। দামোদরের পুত্র দনুজমাধব দশরথদেব বঙ্গবিজয় করে বাংলাদেশে সেনরাজত্বের অবসান ঘটালেন। দেশের এই অংশের উপরে তুর্কী অধিকারকে ক্রমে সুনিশ্চিত করেন সুলতান বলবন। ইনি 1283 সালে সুবর্ণগ্রামে দশরথদেবের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। দশরথদেবের মৃত্যুর পরে বলবন পূর্ব এবং দক্ষিণ বাংলাদেশ সহ বাঙ্গলার উপরে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে এ দেশকে দিল্লীর অধীনে আনা হয়। কার্যতঃ অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল বললে ভুল হয়না। যদিও 1338 সাল পর্যন্ত বলবনের পরিবারভুক্ত লোকের হাতে এর শাসনভার রক্ষিত ছিল।

বলবনের মৃত্যুর পরে, দিল্লী থেকে দেশের দূরত্ব ও নৌযুদ্ধে তুর্কীদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বলবন কর্তৃক নিযুক্ত আফগান গোষ্ঠীপতিরা ঘন ঘন নিজেদের স্বাধীনতা

জাহির করতে লাগলেন। রুকন-উদ্দীন এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী শামস-উদ্-দীন বঙ্গ ও হরিকেলের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকায় তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধিকার বিস্তার করলেন। শামস্-উদ্-দীন অবশ্য তাঁর পুত্র গিয়াস-উদ্-দীন বাহাদুরের কাছে বঙ্গের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারান। গিয়াস-উদ্-দীন সুবর্ণগ্রামকে তাঁর রাজধানী করেন। 1314 সালের মধ্যে তিনি সমগ্র এলাকায় অধিকার বিস্তার করেন।

1324 সালে গিয়াস-উদ-দীন তুঘলক বাংলার বুক অতিক্রম করে সুবর্ণগ্রাম পর্যন্ত অভিযান করেন। তাঁকে সাহায্য করেন শামস্-উদ-দীনের অপর এক পুত্র নাসির-উদ-দীন। কিন্তু এই অভিযানে বিশেষ কোন লাভ হয়না। তিনি শুধু গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের পুত্র বাহাদুর খানকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে এলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাকে তিনভাগে ভাগ করা হল, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব। গিয়াস-উদ-দীন তুঘলক তাঁর পালিত পুত্র বাহ্‌রাম খানকে রাজধানী সুবর্ণগ্রাম সহ বঙ্গের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতগাঁওয়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত করলেন।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক, পিতার সিংহাসনে আরোহণ করে বাহাদুরকে অবিলম্বে সুবর্ণগ্রামে যুক্ত রাজ্যপাল করে পাঠিয়ে দিলেন এবং 1324 সালে বাহরাম খানকে সাতগাঁও-এর নিয়ন্ত্রণ-অধিকার থেকেও বঞ্চিত করলেন। বঙ্গের সিংহাসনপ্রার্থী বাহাদুর খান স্বভাবতঃই সুযোগ পাওয়ামাত্র বিদ্রোহ করলেন। বাহরাম খান বিদ্রোহ দমন করে দিল্লী সুলতানের কর্তৃত্বকে সমতট পার হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন।

1338 সালে, বাহ্‌রাম খানের অস্ত্রবাহক ফকর্-উদ-দীনের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে, বাংলাদেশের উপরে দিল্লীর আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বেরও অবসান ঘটে। তিনি নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন ও স্বাধীন বাঙ্গলার ভিত্তিস্থাপন করেন। 1576 পর্যন্ত এই রাজত্ব বজায় থাকে। আকবরের এক সেনাপতি বাঙ্গলার শেষ আফগান সুলতানকে পরাজিত ও হত্যা করার পর তার অবসান ঘটে। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের হুকুমে, উত্তর বাংলার রাজ্যপাল কাদের খান বঙ্গ আক্রমণ করেন ও খুব স্বল্পকালের জন্য রাজধানী অধিকার করেন, কিন্তু পুনরায় ফকর্-উদ-দীন কর্তৃক বিতাড়িত হন। শেষোক্তর পুত্র ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শা 1350 সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইতিমধ্যে কাদের খানের রাজসভার এক আধিকারিক হাজী ইলিয়াস শাহ, দিল্লীর সুলতান রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 1346 সালে উত্তর বাঙ্গলায় নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এখান থেকে বঙ্গে অভিযান করে তিনি ইখতিয়ার-উদ-দীনকে

পরাজিত করেন ও সুবর্ণগ্রাম দখল করেন। হাজী ইলিয়াস এখন নিজেকে সুলতান শামস্-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ বলে ঘোষণা করলেন। 1353-54 সালে ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলাদেশ আক্রমণের প্রচেষ্টা করেন। শামস্-উদ-দীন, দিনাজপুরের কাছে নদী ও জঙ্গলে ঘেরা একডালার সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিলেন। বাঙালী নৌবহর প্রচণ্ড প্রতিরোধ করল। ফিরোজ অন্যপথে এগোবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শত্রুভাবাপন্ন ও দৃঢ়চেতা দেশবাসীর মুখোমুখি হতে হল। সাধারণ মানুষকে ঘুষ দিয়ে জয় করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ফিরোজ শাহ তুঘলক শান্তিস্থাপন করতে ও শামস্-উদ-দীনের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। রাশিয়ার জেনারেল বরফের মত বাংলাদেশের জেনারেল নদী আর একবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জয়ের গৌরব অর্জন করল।

1356 সালে শামস্-উদ-দীনের মৃত্যু হয়, এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিকন্দরকে ফিরোজ শাহ তুঘলকের আর একটা আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। সিকন্দর তাঁর পিতার কৌশল অবলম্বন করে একই ফল পেলেন। বর্ষার আগে ফিরোজ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। সিকন্দরের মৃত্যু হয় তাঁর বিদ্রোহী পুত্র গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ-র বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, যুদ্ধ ও গুপ্তহত্যার আর একটা যুগ আসে। আজম 1410 সালে মারা যান। এঁর রাজত্বকালে, দিনাজপুরের এক স্থানীয় ভূস্বামী, গণেশ, কার্যতঃ স্বাধীনতা অর্জন করে এ অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আজমের প্রপৌত্র আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে দুইজন স্বাধীন রাজার আবির্ভাব হয়, দনুজবর্ধনদেব ও মহেন্দ্র দেব। গণেশের পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, ও জালাল-উদ-দীন নামে পরিচিত হন। তাঁর রাজত্ব সমগ্র মধ্য ও পূর্ব বাংলাদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জালাল-উদ-দীন সতেরো বছর ধরে একটা স্থিতিশীল ও শক্তিশালী রাজত্ব চালিয়েছিলেন।

এর পরবর্তী যুগ আবার অশান্তি ও বিক্ষোভে জর্জর। 1437 সালে পূর্ববর্তী শাহ্ রাজত্বের নাসির-উদ-দীন মহম্মদ শাহ্, সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ না করা পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। তাঁর উত্তরাধিকারী রুকন-উদ-দীন বরবক শাহের রাজত্বকালে, সুবর্ণগ্রামের কর্তৃত্ব আর একবার পূর্ব ও দক্ষিণে প্রসারিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে সমগ্র বাংলাদেশ শাহ্ রাজত্বের অধীনে আসে। এই সময়ে আবার রুকন-উদ-দীনের হাবসী রক্ষীবাহিনীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাসাদ-বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের ফলে বারবার শাসকদের পদচ্যুতি ঘটতে থাকে। অবশেষে

তদানীন্তন হাবসী শাসক সুলতান শামস-উদ-দীন মুজঃফর শাহের উজীর সঈদ হুসেনের নেতৃত্বে 1493 সালে এক গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। এই বিদ্রোহ মোগলসম্রাট বাবরের দিনপঞ্জীতে লেখা বাঙ্গালী কৃষক চরিত্রের মোটামুটি সঠিক রূপায়ণের বিরুদ্ধ আচরণ। মোগলসম্রাট বাবরের বক্তব্য : "বাঙ্গালী বলে, 'আমরা সিংহাসনের অনুগত, সেখানে যেই বসুক, আমরা তাকেই মানি।'' কিন্তু বাঙ্গালীর অসীম ধৈর্য ও সহ্যশক্তিরও তো একটা সীমা আছে!

সঈদ হুসেন ছিলেন আরব, রংপুরে আজন্মপালিত। কৃতজ্ঞ বাঙ্গালীজাতি তাঁকে স্বভাবতঃই বাংলার নতুন সুলতানের পদে নির্বাচিত করল। আলা-উদ-দীন হুসেন শাহ্‌—এই নাম গ্রহণ করে তিনি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর রাজত্ব স্থাপন করলেন। এই রাজত্ব অবশ্য পৌঁছেছিল আর একটু দূরে বাংলাদেশ পর্যন্ত। ইতিহাসে তিনি মধ্যযুগীয় বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সুলতান হিসেবে পরিচিত। তাঁর সমনামধারী জৌনপুরের পলাতক শারকি শাসকের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনের অপরাধে তিনি সিকন্দার'শা লোদীর ক্রোধভাজন হন। হুসেন 1495 সালে শান্তি স্থাপনের জন্য আলাপ আলোচনা চালান, ও বাঙ্গলাকে যুদ্ধের কঠোর বিড়ম্বনা থেকে বাঁচান। তাঁর মৃত্যু হয় 1519 সনে, রেখে যান 18টি পুত্রসন্তান। স্থানীয় প্রধানগণ, সর্বজ্যেষ্ঠ নুসরত শাহ্‌কে নির্বাচন করে সিংহাসনে বসান। নুসরত শাহ্‌ আরও পূর্বদিকে রাজত্ব বিস্তার করেন। আর একবার সুবর্ণগ্রাম ও চট্টগ্রাম এক অখণ্ড রাজত্বের অংশীভূত হয়। নুসরত শাহের উত্তরাধিকারভার গ্রহণ করে পর পর কয়েকজন দুর্বলপ্রকৃতি রাজা। অবশেষে, দিল্লীর সুলতান শের শাহ্‌ গিয়াস-উদ-দীন মহম্মদ শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করেন। শের শাহ্‌ তাঁর সুবুদ্ধিচালিত রাজত্বকালে মধ্য ও দক্ষিণ বাংলাদেশের উপরে নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সফল হন।

দিল্লীতে মোগলদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে (1555), আফগান রাজন্যবর্গ তাঁদের সুরক্ষিত ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত হলেন, ও শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিলেন বাঙ্গলায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে। এই ভূখণ্ড আবার দিল্লীর নিয়ন্ত্রণাধিকারে আসে 1576 সাল নাগাদ আকবরের রাজত্বকালে। বাঙ্গলার তরুণ আফগান শাসক দাউদ খাঁ তাঁর পিতা সুলেমান করিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দিল্লীর সরকারী কর্তৃত্ব পর্যন্ত মানতে অস্বীকার করেন। 1574 সালে আকবর স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে দাউদকে তাঁর নিজস্ব ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করেন। মোগল সেনাপতিরা তাঁকে নির্মমভাবে অনুসরণ ক'রে অবশেষে পরাজিত ও হত্যা করে। তা সত্ত্বেও মোগল শাসন শুধু শহরেই কার্যকর ছিল। গ্রামাঞ্চল ছিল পদচ্যুত আফগান রাজন্যবর্গ ও স্থানীয়

গোষ্ঠীপতিদের অধিকারে। আসলে সমগ্র বাঙ্গলা সাম্রাজ্যের একটা অখণ্ড অংশ ছিল না, ছিল সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এক ভূখণ্ড। এ ধরণের পরিস্থিতির ফলে স্বভাবতঃই একদিকে ছিল উৎপীড়ন, ও অপরদিকে বিদ্রোহের অস্থিরতা।

বাংলাদেশ ঈশা খাঁর অধীনে কিছুটা স্বাধীন রাজত্বের ভূমিকা পালন করছিল। ঈশা খাঁর রাজধানী তখন সোনারগাঁও। বাংলার রাজ্যপাল সাবাজ খাঁ 1583 সালে ঈশা খাঁকে দমন করার জন্যে বিক্রমপুর আক্রমণের চেষ্টা করেন। অন্যান্য আফগান রাজন্যবর্গ ও স্থানীয় হিন্দু গোষ্ঠীপতিদের সহায়তায় ঈশা খাঁ সেই আক্রমণ রোধ করতে সক্ষম হন। শেষ পর্যন্ত 1587 সালে মিত্রদের সহায়তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার পর, তাঁকে মোগলদের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করা সম্ভব হয়। 1612 সালে বাঙ্গলায় আফগান ভূস্বামী উসমান খাঁর নেতৃত্বে এক মহতী অভ্যুত্থান ঘটে। এ ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান গোষ্ঠীপতিদের একই রকম সহায়তা ছিল। এই বিদ্রোহ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কঠোরভাবে দমন করা হয়, কিন্তু জাহাঙ্গীর অনুসৃত তোষণনীতি এই বিদ্রোহের যথার্থতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

শা' জাহানের শাসনকালে রাজপুত্র সুজাকে বাংলাদেশ সহ পূর্বাঞ্চলগুলির দায়িত্বভার দেওয়া হয়। শা' জাহানের রাজত্বের শেষ ভাগে যে ক্ষমতার সংগ্রাম চলতে থাকে সেই সময়ে ঔরংজেবের সৈন্যদলের হাতে সুজা পরাজিত হন। 1659 সালের 9 জানুয়ারী সেই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন ঔরংজেব স্বয়ং। তাঁর সেনাপতি মীর জুমলা সুজাকে অনুসরণ করে একেবারে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করেন ও ঢাকা অধিকার করেন। এখান থেকে 12,000 অশ্বারোহী সৈন্য, 30,000 পদাতিক সৈন্য এবং 300-এর বেশী যুদ্ধজাহাজ নিয়ে বাংলাদেশ পার হয়ে হতভাগ্য সুজার পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য যাত্রা করেন। সমগ্র বাংলাদেশ মীর জুমলার অধিকারে আসে 1660 সালের মে মাসে, এবং সুজা ও তাঁর পরিবারবর্গকে পূর্বাঞ্চলের সীমানার ওপারে আরাকান পর্বতের ভিতরে ঠেলে দেওয়া হয়। সেখানেই সমস্ত পরিবার বিনষ্ট হয়।

ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে ঔরংজেবের বিজয়ের মধ্যে মীর জুমলার অবদান ছিল প্রচুর। পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে বাংলার রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে ঔরংজেব তাঁর মাতামহ শায়েস্তা খাঁকে বাংলায় পাঠালেন। দুই বৎসরের স্বল্পকাল বাদ দিলে, তিনি সুবে বাংলার উপরে আধিপত্য করেন প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। এইরকম সময়ে পশ্চিমবঙ্গের হুগলীর বুকে পোর্তুগীজরা বাণিজ্যকেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে জলদস্যুবৃত্তির জন্য ইতিমধ্যেই

তাদের যথেষ্ট দুর্নাম হয়। পূর্বাঞ্চল সীমান্তপারের মগ জলদস্যুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত সমস্ত দেশকে তারা আতঙ্কবিহ্বল করে রাখে। এমনকি আরাকানের রাজা, চট্টগ্রামকেও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। শায়েস্তা খাঁ ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপকে জলদস্যুমুক্ত করেন ও 1666 সালে আরাকান শাসককে চট্টগ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেন।

হুগলী নদীতে ইংরেজ বণিকের সঙ্গেও শুল্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে শায়েস্তা খাঁর সংঘাত বাধে। এরই পরিণতিতে তাঁর ও ইংরেজের মধ্যে এক অঘোষিত, আধা-সরকারী সংগ্রাম চলে। এবং প্রায় এই সময়ই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের অভিলাষ দানা বাঁধে। লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুরাকাংখী ও অত্যুৎসাহী প্রধান স্যার জোসিয়া চাইল্ড ভারতে ব্রিটিশদের জন্যে একটা শক্ত ঘাঁটি পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

1685 খ্রীস্টাব্দে স্যার জোসিয়া, চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকার করার উদ্দেশ্যে রাজা দ্বিতীয় জেমস-এর কাছ থেকে প্রায় এক ডজন যুদ্ধজাহাজ পাঠাবার অনুমতি আদায় করলেন। শায়েস্তা খাঁ ও তাঁর নৌবাহিনী-অধিনায়কদের বাহাদুরী যে, এই অভিযানের শেষ হল দুঃসাহসী ইংরেজ বণিকগণ ও তাঁদের শুভার্থী রাজার পরাজয়ে। মোট ফল হল এই যে, ইংরেজকে 16৪8 সালে বাঙ্গলা থেকে একেবারে সরে যেতে হল।

শায়েস্ত খাঁ অবসর গ্রহণ করার পরে তাঁর জায়গায় যখন ইব্রাহিম খাঁ এলেন, তখন দেশের পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ইংরেজরা বাঙ্গলা থেকে বিতাড়িত হবার সময়ে হুগলীর ইংরেজ বসতির যিনি সচিব ছিলেন, সেই জব চার্ণককে নতুন রাজ্যপাল প্রত্যাবর্তনের আমন্ত্রণ জানালেন। 1690 সালের 24শে অগাস্ট এই দূরদর্শী ও সাহসী ইংরেজ বণিক হুগলী নদীর পারে একটি ক্ষুদ্র ইংরেজ বসতির গোড়া-পত্তন করলেন তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে—সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা।

শায়েস্তা খাঁর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি, আগ্রায় তখন তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষমান। তাঁর বোঝারও ক্ষমতা ছিল না যে, বিদেশীর লোভের গ্রাস থেকে প্রিয় দেশকে বাঁচানোর জন্যে তাঁর নির্ভীক প্রচেষ্টা এইভাবে বিনষ্ট হল। মোগল শাসনের গৌরবময় ইতিহাস চরম সমাপ্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল। নাটকের শেষ অঙ্কে, রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পতনের আগেই পার্শ্বদ্বারে ইংরেজ তার তরবারি শানাচ্ছিল। তাদের কার্যকলাপের প্রধান ঘাঁটি হল বাঙ্গলা। কোন শক্তি এপর্যন্ত যা অর্জন করতে পারে নি, ইংরেজ তাতে সফল হল। বাংলাদেশের পরবর্তী 250 বছরের ইতিহাস, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেল। □

চার

গভীর শিকড়ে

ভবনদী গভীর, গম্ভীরবেগে বহিয়া চলে ; দুই
তীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নাই।

—চর্যাপদ (সপ্তম শতাব্দী)

প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজের বিজয় পর্যন্ত, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীগুলি, বিভিন্ন যুগে, নিজেদের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। তাদের চেষ্টা প্রায়শঃই সফল হয়েছে এই কারণে, যে তখনকার দিনে এই বিরাট উপমহাদেশকে একটা কেন্দ্রীভূত শাসনের গণ্ডীতে বেঁধে রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। এমনকি দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে অন্যদিকে সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টাও বিফল হয়েছে। এই নদীবেষ্টিত ভূখণ্ড, বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে একটা দূরত্ববোধের চেতনার উদ্রেক করেছিল, পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে সেটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

যাই হোক, ভৌগোলিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের একাংশ হওয়ার দরুণ বাংলাদেশের পক্ষে পশ্চিমদিকের নিকটতম প্রতিবেশী ও দেশের বাকী অংশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা অসম্ভব ছিল। ইতিহাসের ক্রমবিকাশ উভয়ের সমউত্তরাধিকারের সৃষ্টি করল ও একটা পর্যায়ে সমগ্র অবিভক্ত বাংলাকে একটা সাধারণ জাতীয় চেতনায় পরিব্যাপ্ত করল। এই বাস্তব সত্যকেই বাংলাদেশের এক প্রাচীন কবি সাধারণ মানুষের নিত্য অভিজ্ঞতায় নিহিত ভাবমূর্তি ব্যবহার করে দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মধ্যপথে নদীর অগ্রগতির পথ রোধ করা অসম্ভব, ইতিহাসের রেখে যাওয়া সাধারণ উত্তরাধিকারের গুরুভার পলিমাটির স্তর জলপ্রবাহে ক্ষয় হয় না।

খ্রীস্টপূর্ব প্রায় তৃতীয় শতাব্দী থেকে একটা সর্বভারতীয় সংস্কৃতির আবির্ভাবের প্রথম উন্মেষ দেখা দিল। বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবই তাকে

উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল স্রোতের মাঝখানে টেনে আনল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম যখন বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও তিব্বতে বিস্তৃত হল, তখন তাদের সঙ্গেও একটা যোগাযোগ হল। বিক্রমপুরজাত বৌদ্ধধর্মের প্রচারক দীপঙ্কর, দশম শতাব্দীতে এইসব দেশে গিয়েছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষই তার প্রমাণ।

প্রাক্-গুপ্ত যুগে জৈনধর্মেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙ্গলায় বিস্তারিতভাবে পৌঁছয় মাত্র খ্রীস্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীর পরে ও গুপ্ত রাজত্বে তার সমাদর বাড়ে। ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি বাংলাদেশেও তা পৌঁছে যায়।

সম্ভবতঃ বাংলাদেশের মাটিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের মধ্যে বাংলাভাষা জন্ম নেয়। সেসময়ে শাসকশ্রেণীর ভাষা ছিল সংস্কৃত। বহু বাংলাদেশী বৌদ্ধ পণ্ডিতের সংস্কৃতে গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। যথা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও হিউয়েন সাং-এর গুরু শীলভদ্র, এবং বারেন্দ্রীর বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ, কবি ও নাট্যকার চন্দ্রগোমী। জনসাধারণের মধ্যে অবশ্য প্রাকৃত, মাগধী অপভ্রংশ এবং সৌরসেনী অপভ্রংশ মিলে মিশে আদি বাংলার সৃষ্টি হল। বৌদ্ধদের নাথপন্থী নামে একটা বিশেষ সম্প্রদায় এই ভাষাকে পুষ্ট করলেন জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের ধর্ম প্রচার করার জন্যে। নাথপন্থীরা ছিলেন তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুষ্ঠান সেই অঞ্চলের আদিম উপজাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়, স্বভাবতঃই তারা সেইদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। বাংলাভাষার জন্ম হয় এক হিসেবে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ শাসকদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত বাংলাদেশবাসীর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। এ-ভাষার সর্বপ্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায় চর্যাপদগুলিতে। চন্দ্রদ্বীপ বা সন্দ্বীপের অধিবাসী মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ চর্যাপদের সর্বপ্রথম পরিচিত কবি। তিনি খ্রীস্টোত্তর 657 সালে নেপালে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

প্রায় এইসময়েই দেশের বিভিন্ন অংশে একটা রাষ্ট্রচেতনার লক্ষণ ফুটে ওঠে। বাঙ্গলাও তার ব্যতিক্রম নয়, বরং বলা যায় এই বিশেষ লক্ষণগুলি প্রকাশের প্রথম প্রবর্তকদের অন্যতম। স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্রমান্বয় পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফলে একটা সাধারণ বর্ণমালা, ভাষা ও সংস্কৃতি জন্ম নেয়। সেইসঙ্গে চার বা পাঁচ শতাব্দীব্যাপী এই অঞ্চলে একটা কেন্দ্রীয় শাসন যুক্ত হয়ে অনুকূল আবহাওয়া গড়ে ওঠে। শশাঙ্কর রাজত্বকালে এর আরম্ভ। সামন্ততান্ত্রিক বিরোধের একটা যুগ এই অগ্রগতিকে কিছুদিনের জন্যে থামিয়ে রাখে। গুপ্ত রাজারা

না-আসা পর্যন্ত। গুপ্তরাজাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আদান-প্রদানের পথ খুলে দিল। পালরাজারা এই একাত্মবোধের শক্তিকে আরও পুষ্ট করেন। চার শতাব্দীব্যাপী অব্যাহত শাসন ও পালরাজত্বের বিস্তৃতি, একটা গর্ব ও একতাবোধের সৃষ্টি করেছিল। একটি একক জাতির প্রথম উপাদানগুলিকে চেনা যাচ্ছিল। গৌড়ের নিজস্ব ধরণের সাহিত্য বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। এমনকি এর প্রভাব উপমহাদেশের অন্যান্য অংশেও পৌঁছে গেল। ভৌগোলিক অবস্থিতির প্রসাদে বাঙ্গলা এলাকা যেমন ইংরেজবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অন্যদের তুলনায় কিছুটা স্বায়ত্বশাসনের স্বাদ উপভোগ করে চলেছিল, তেমনি এই একতাবোধের চেতনা গড়ে উঠেছিল প্রথমে গৌড় দেশ ও ঢাকা, অবশেষে বাঙ্গলার শেষ নবাবদের রাজত্বকালে—মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে।

এই সময়ে বহু সাধারণ আচার, অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির আবির্ভাব হয়, যা পরবর্তীকালে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস সত্ত্বেও বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এদেরও জন্ম বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের উপজাতীয় আচার-ব্যবহারের পারস্পরিক যোগাযোগে। এই সময়ের সাহিত্য অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সকলের পোষাক একইরকম ছিল, ছেলেরা ধুতি পরত, আর মেয়েরা শাড়ী। ছেলেদের কোন শিরস্ত্রাণ ছিল না। মেয়েরা চোখে কাজল দিত, আর কপালে সিন্দুরের টিপ পরত।

উত্তর বাংলাদেশে মেয়েদের গানে তখনকার জীবনযাত্রার অনেক অন্তরঙ্গ খুঁটিনাটি প্রতিফলিত হয়। রাজশাহী ও রংপুরের গানে যেসব সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, তাতে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তাদের অনেক মিল। অনেক প্রতীকচিহ্ন, তাদের আদি ধর্মীয় তাৎপর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্বজনীনতা লাভ করেছে। কোন বিশেষ ধর্মের বন্ধনমুক্ত হওয়ার ফলে তারা দেশের মাটির সঙ্গে গাঁথা সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। কিছু এসেছে সুদূর অতীতের উপজাতীয় ঐতিহ্য থেকে। মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে তখনও পরবর্তী যুগের বৃহৎ ধর্মগুলির উদ্‌ভাবন হয়নি।

রাজশাহী ও রংপুরের ওইসব গানগুলিতে যে-নদীর উল্লেখ আছে, তা সর্বদাই যমুনা, প্রেমিকের হাতে সর্বদাই বাঁশী, আর সিঁথিতে সিন্দুর হল বিবাহের চিহ্ন। বাংলাদেশে আছে যমুনা নদী। নৌকার মাঝি আর রাখাল ছেলে আজও সকরুণ প্রাণমাতানো সুরে বাঁশী বাজায়। কিন্তু ঐতিহ্যের মেলামেশা অস্বীকার করা যায় না।

মুসলমান সমাজের গানে আছে প্রাচীন চিত্রকল্পের ব্যবহার, এবং প্রাক-মুসলিম যুগের আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ। অন্য দিকে হিন্দু সমাজের গানে মুসলমান-পরবর্তী যুগের একই ধরণের চারিত্রিক বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। আজও বাংলাদেশে মুসলমানের বিবাহে যে আচার-অনুষ্ঠান অনুসৃত হয় তা বেশীর ভাগই হিন্দু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুরূপ। আলপনার মত প্রতীকী চারুশিল্প হিন্দু ভাবার্থ হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে। তখন সেটা শুধু শুদ্ধতা ও শুভ লক্ষণের প্রতীক।

চর্যাপদের ঐতিহ্য লোকসাহিত্যের মধ্যে রক্ষিত আছে। সর্বপ্রথম রচনাগুলি গাওয়া হত, এই ঐতিহ্যই পরে গাজীর পটে পৌঁছয়, ছবির সঙ্গে গান। আজও নদীতীরগুলি হৃদয়স্পর্শী বাউলের গানে মুখরিত হয়। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের অনুভূতিকে পৃথক করে দেখা হয় না। চর্যাপদের ভাষার রেশ কিছু মুসলমান কবির প্রথমদিকের লেখায় পাওয়া যায়, যেমন 'শেখ-শুভোদয়া'তে।

ধর্মবিরোধের প্রথম বীজ বপন করেন সেন ও বর্মণরা দ্বাদশ শতাব্দীতে, যখন মোটামুটি একটা উদারপন্থী সমাজে তাঁরা সবার উপরে স্থান দিলেন ব্রাহ্মণদের। সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের দ্বন্দ্ব লাগল। শাসক ও শাসিতদের মধ্যে বিরোধ জেগে উঠল। এই আবহাওয়ায়, তুর্কী আক্রমণ স্বাধীনতার বার্তা নিয়ে এল। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধধর্ম দশম শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল, যদিও অনেক পরিবর্তিত আকারে। প্রত্যেক ধর্মই তার পারিপার্শ্বিক থেকে কিছু না কিছু আত্মস্থ করে। যেহেতু বৌদ্ধরা ও নাথপন্থীরা মূর্তির উপাসক ছিলেন না, তাঁদের পক্ষে তুর্কী আক্রমণকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, এমনকি ইসলামকে গ্রহণ করাও সহজ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ সমাজের উচ্চ শ্রেণী-বিভাগের কাঠামোর মধ্যে নিপীড়িত কৃষক সমাজের কোন স্থান হল না। ইসলামের সামাজিক সমতার বাণী কৃষককে তাই অতি সহজেই আকৃষ্ট করল।

তুর্কী আক্রমণের আগেও, বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম পৌঁছেছিল আরব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। চট্টগ্রামের বর্ধিষ্ণু বন্দরে এঁরা এসেছিলেন। চট্টগ্রামে এখনও অনেক লোকের মুখে দেখা যায় সুস্পষ্ট আরব ছাপ। জোর করে বিরাট সংখ্যক লোককে ধর্মান্তরিত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুফীদের ঔদার্য সাধারণ মানুষের মনে সহজেই দাগ কেটেছিল। বৌদ্ধ এবং নাথপন্থী, উভয়েই ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করলেও, নিজেদের অনেক ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন, ব্রাহ্মণসমাজ বহির্ভূত কৃষকসমাজ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। হিন্দুরা সত্যপীরের পূজো অতি সহজে

গ্রহণ করেছিলেন। যেমন মুসলমানরা অতি সহজে স্বীকার করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্মকে। বাউলদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ছিলেন, উভয় ধর্মের মধ্যে সাধারণ বিষয় ও দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে তাঁরা গান গেয়ে বেড়াতেন, গানের বক্তব্য ছিল মূলতঃ মানবতাবাদ।

এইভাবে একটা সর্বভারতীয় সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যে বিকাশোন্মুখ বাঙালী রাষ্ট্রচেতনার সাধারণ উপাদানগুলি আরও প্রবল হয়ে উঠল। গাঙ্গেয় উপত্যকার ভাস্কর্যের প্রভাবের মধ্যে, বিশেষ করে গুপ্ত রাজাদের সময়ে, একটা বৃহত্তর উপমহাদেশীয় ছাপ ইতিপূর্বেই দেখা গিয়েছিল। পালরাজত্বের সময়ের কিছু পাথরের ভাস্কর্যও পাওয়া গেছে। পাহাড়পুর, ময়নামতী ও দিনাজপুরে যে স্থানীয় পোড়া ইঁটের ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যের প্রচুর মিল। যদিও ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ভাস্কর্যের দ্যুতি ম্রিয়মান হয়ে গেল, এবং স্থাপত্যবিদ্যা পশ্চিম এশিয়ার ঐতিহ্যকে আত্মভূত করল। এক্ষেত্রেও কিছু স্থানীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটল। বাঙ্গলায় যে-স্থাপত্যধারা বিকশিত হল, দেশের অন্যান্য অংশেও তা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। অতএব এক্ষেত্রেও, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সাধারণ উপাদানগুলিকে অঙ্গীভূত করেছে।

তুর্কী ও পাঠান অভিযানের চাপে বাংলা ভাষা বহু নতুন ফার্সী ও আরবী শব্দে সমৃদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী প্রভাব উর্দু। উত্তর ভারতে, বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কথ্য ভাষার সঙ্গে ফার্সী ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষার বিকাশ হয়। এই অভিযানের সামাজিক আঘাতের পরিণাম বাংলাদেশে ধর্মান্তরিত মুসলমানের বিরাট সংখ্যাই শুধু নয়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ফার্সী খেতাব উদ্ভূত বহু পদবীর গ্রহণও বটে, যথা খাঁ, মল্লিক, সারখেল, সরকার, মজুমদার, তালুকদার, হালদার, মহলানবীশ, খাসনবীশ, চৌধুরী, মুন্সী, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, বক্সী প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গেও এই পদবীগুলি বিদ্যমান। জাতিগতভাবে এই দুই দেশের অধিবাসী অবিচ্ছেদ্য। তারা একই ভাষায় কথা বলে। একমাত্র পার্থক্যচিহ্ন মুসলমান ব্যবহৃত ফার্সী অথবা আরবী অনুসারী ব্যক্তিগত নাম। এব্যাপারেও বর্তমানে বাংলাদেশে কিছু পরিমিতি দেখা গেছে। পরবর্তীকালে দেশের উভয় অংশের ভাষাই, পোর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী ও ওলন্দাজ শব্দের যোগ দ্বারা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তাই ইতিহাস ও বিভিন্ন প্রভাবের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটা সাধারণ সংস্কৃতি ও সাধারণ ভাষার উত্তরাধিকারী হয়েছে। ভাষারও শ্রেণীগত ও ধর্মগত সূক্ষ্ম তারতম্য আছে। পাঠানদের শাসনকালে অবশ্য

হিন্দু ও মুসলমানের ভাষার ভিতরে খুব অল্পই প্রভেদ ছিল। মধ্যযুগীয় বাঙ্গলায় সর্বত্র অভিজাত সম্প্রদায় ফার্সী ভাষা ব্যবহার করতেন। পশ্চিমে গৌড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর, একটা মিশ্রিত ভাষার উদ্ভব হয়, পশ্চিমবঙ্গেই যার প্রচলন বেশী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অনবরত দেশদখলের যুদ্ধ ও স্থানীয় গোষ্ঠীপতিদের বিদ্রোহের দরুণ এ-সময়টা বাংলা সাহিত্যের দারুণ দুর্দিন। বাঙ্গলায় একমাত্র স্বাধীন সুলতানদের আবির্ভাবের পর থেকে, মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ একটা সাধারণ কৃষ্টি ও সাধারণ ভাষার ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হয়। সুলতানরা এই কারণেই বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বিকাশে উৎসাহ দিতেন। এর ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান কমে যায়। এই সময়টা তখন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এর সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুলতান হুসেন শাহ্। বাঙ্গলায় একটা সাধারণ জাতির ভিত্তিস্থাপনে এই 200 বছরের অবদান অতুলনীয়। বিস্ময়করভাবে, 1971 এর পরবর্তী বাংলাদেশে, অনেক বুদ্ধিজীবী পাঠান শাসকদের জাতীয় উত্তরাধিকারের অংশ বলে মনে করেন, আর মোগলদের মনে করেন বহিঃশত্রুর শামিল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল লোককাহিনী, এবং সংস্কৃত ও ফার্সী ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ। এই সময়ে যে মোটামুটি 147 জন কবির লেখা আমাদের হস্তগত হয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশ কবিই বাংলাদেশবাসী! মধ্যযুগের বাংলাদেশের শতাধিক মুসলমান কবি নির্বিচারে বৈষ্ণব ও ইসলামী বিষয়-বস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন যে-পঁয়তাল্লিশটি লোকগীতি ময়মনসিং থেকে সংগ্রহ করেছেন, তার তেইশটি মুসলমানের রচনা। হিন্দু কবিরা প্রধানতঃ ধর্মবিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ধর্মনিরপেক্ষ কাব্যের ফার্সী ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকরা নিয়ে আসেন। হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে প্রভেদ ছিল অতি নগণ্য।

পশ্চিমবঙ্গে যখন আরবী ও ফার্সী শব্দের প্রাধান্যসহ একটা মিশ্রিত বাংলার বহুল প্রচলন ছিল, সেরকম সময়ে, বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খাঁটি কিংবা সংস্কৃতপ্রধান বাংলার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' ও হায়াৎ মাহমুদের 'জারি জংনামা' সংস্কৃতবহুল রচনা। অন্যদিকে আমরা দেখি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর 'কালিকামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল' ও 'শীতলামঙ্গল'-এ প্রচুর উর্দু ও ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিষয়বস্তু নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলমান

লেখকদের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। যেমন সুবিখ্যাত আলাওল লিখেছেন 'পদ্মাবতী', আর রাধাচরণ গোপ লিখেছেন 'ইমিন'-এর গাথাসঙ্গীত।

200 বছর প্রভুত্ব করার পর স্বাধীন সুলতান রাজত্বের চরম অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা আরাকান শাসকদের রাজসভায় গিয়ে পৌঁছল ; এঁদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল চট্টগ্রাম পর্যন্ত। উদাহরণস্বরূপ আলাওল আরাকান-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এরও শেষ হল বাঙ্গলায় অর্ধ-স্বাধীন নবাব হিসাবে মুর্শিদ কুলি খাঁ-র আবির্ভাবের সঙ্গে। ইনি সুবে বাংলার রাজধানী আবার পশ্চিমে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, এবারে মুর্শিদাবাদে। নবাবদের দরবারে ফার্সী ও উর্দূ ভাষার চলন ছিল। এতদিনে অবশ্য, বাংলাভাষার মূল কাঠামো, বাংলা সাহিত্যের চারিত্রিক বিশেষত্ব, ও সমগ্র বাঙ্গলাকে ঘিরে একটা সাধারণ জাতীয়তাবোধ, বিভিন্ন ধর্মজাত রীতিনীতির পার্থক্য অগ্রাহ্য করে, সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

পাঁচ

দেশ-ভাগ ও ইংরেজের বিদায়

বাঙালীরা, যারা নিজেদের একটা জাতি মনে করে খুশী হয়, যারা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে একদিন ইংরেজরা বিতাড়িত হবে, এবং এক বাঙালীবাবু কলকাতার লাট-প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হবে, অবশ্যই তাদের স্বপ্ন সফল হবার পথে কোনরকম বাধাবিপত্তি এলে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। আমরা যদি এখন তাদের চিৎকারে কান দেবার মত দুর্বল হয়ে পড়ি, তবে আর কখনই বাংলাকে খণ্ডিত করতে বা দমাতে পারব না। বরং ভারতের পূর্বসীমান্তে যে শক্তি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রবল হয়ে উঠেছে, তাকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তোলা হবে, ও ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে সেটা একটা ক্রমস্ফীত অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

—লর্ড কার্জন (1904)

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইংরেজের ভারত দখল সম্ভব হল। ভাগ্যের পরিহাস এই—অগ্রগতির শৃঙ্খল ছিন্ন হল বিদেশীর হস্তক্ষেপে, ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথে নয়। এই বিকৃত বিকাশের প্রথম ধাক্কা এসে লাগল বাঙ্গলার গায়ে। পলাশীর যুদ্ধের ফলে, রাতারাতি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।" স্থানীয় বণিকসমাজ বিদেশী বণিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কুণ্ঠাবোধ করল না। তারা এক ভাষায় কথা না বললেও, বাণিজ্য ও লাভের ভাষাটা একই ছিল। অবক্ষয়ী সামন্ত-গোষ্ঠীপতিদের বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ করার মত অবস্থা একেবারেই ছিল না। নতুন শাসনকর্তাদের ক্রমবর্ধমান দাবী মেটাবার চেষ্টায় ভূস্বামীরা শুধু কৃষকদের উপরে অত্যাচার বাড়িয়ে দিল। তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মোকাবিলা প্রতিবারই হতে লাগল ইংরেজের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে, ফলে সেই বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রূপ নিতে লাগল।

বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল বাংলাদেশে। গোড়ার দিকে এই বিদ্রোহ

সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে হওয়ায় তার কিছুটা ধর্মীয় চরিত্র ছিল। তা হলেও এই বিদ্রোহের একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। সাধারণ মানুষের দাক্ষিণ্যের উপরে এই ধর্মীয় ভিক্ষাব্রতীদের জীবিকা নির্ভরশীল হওয়ায়, ইংরেজের অত্যাচারে জনগণের দারিদ্র্য তাদের জীবিকা অর্জনকে ব্যাহত করছিল। সেইজন্যেই, ঘৃণার পাত্র 'ফিরিঙ্গী'-দের বিরুদ্ধে তাদের এই আক্রমণ। এই সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কৃষকসমাজ, হৃতসর্বস্ব কারিগর ও ছোটখাট ব্যবসায়ীরা এসে এই লড়াইতে যোগ দিল। কিছু ক্ষুদ্র জমিদারদেরও এতে সমর্থন ছিল। 1763 সালে ঢাকাতে ইংরেজদের এক কারখানার উপরে হামলা দিয়ে ঘটনার শুরু। 1770 সালের দুর্ভিক্ষে, সরকারী হিসেবেই দেড়কোটি লোকের মৃত্যু হয়। বিদ্রোহীর সংখ্যা এর পরে আরও স্ফীত হয়। ক্রমে সারা পূর্বভারতে এই বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়, কিন্তু বাংলাদেশই তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইল।

বিভিন্ন মাত্রার তারতম্যের মধ্যে দিয়ে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ প্রায় সাঁইত্রিশ বছর ধরে চলেছিল। এর মধ্য থেকে কিছু নেতা বেরিয়ে এলেন, যাঁদের ঘিরে লোক-কাহিনী গড়ে উঠল। মজনু শাহ্ এঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম। ইনি সম্ভবতঃ বিহার থেকে এসেছিলেন, বাংলাদেশে বসবাস করছিলেন, ও বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে প্রাণ দেন। ঐক্যস্থাপনের জন্যে মজনু শাহ্‌র বারংবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, অন্তর্বিভেদ ও নির্মম অত্যাচার দুই মিলে পূর্বভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে অতি দ্রুত বিদ্রোহের সমাপ্তি হল। তবে 1800 সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুদিন অন্তর এর স্ফুরণ দেখা যায়। এই সময়ে সন্দ্বীপ, যশোর-খুলনা, দক্ষিণ বাখরগঞ্জ ও রংপুরে বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র বিদ্রোহ ঘটে, পরে তা কুচবিহার ও এর পশ্চিমে দিনাজপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

1793 সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষিসম্পর্কের যে পরিবর্তন আনে, তার ফলে এক বহুবিস্তৃত কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা উপজাতি ও ময়মনসিংয়ের গারো এবং হাজংরা বারবার বিদ্রোহ করে। এ যুগের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কৃষক অভ্যুত্থান হল ফারাইজি বিদ্রোহ।

ফরিদপুরে এক গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় এটা শুরু করে, পরে এর মধ্যে একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র এসে পড়ে, তার কারণ এই বিদ্রোহের নেতারা সমস্ত রকম শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্রের ধর্ম প্রচার করতেন। এটা একধরণের আদিম সাম্যবাদের প্রচেষ্টা, যা স্বভাবতঃই বাংলাদেশের কৃষকগোষ্ঠীকে

আকর্ষণ করেছিল। এর বিখ্যাত নেতা দুধু মিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতারও স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর জনপ্রিয়তা এত প্রবল ছিল, যে বহুবার গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষীর অভাবে তাঁর অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। 1857-এর মহাবিদ্রোহ কিন্তু বাংলাদেশে কোন প্রত্যক্ষ সাড়া জাগায়নি, সম্ভবতঃ কোম্পানীর সামরিক বিভাগে কোন বাংলাদেশী সৈন্য না থাকার দরুণ। তা হলেও. চট্টগ্রাম ও ঢাকার সিপাহীবিদ্রোহ বাংলাদেশের কোন কোন অংশে ফারাইজি আন্দোলনের পুনরভ্যুদয় আনে।

1857-এর অব্যবহিত পরে, বাংলাদেশের কৃষককুল নীলবিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আসলে প্রথম প্রতিবাদ শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় শুরু হয়ে আন্দোলন বাংলাদেশে ময়মনসিং-এ ছড়িয়ে পড়ে 1829 সালে। তারপর সারা বাঙ্গলা জুড়ে বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে ওঠে 1860 সালে। বাংলাদেশে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল যশোর, পাবনা, রাজশাহী ও ফরিদপুর। যশোরে তার শেষ প্রতিধ্বনি শোনা গেছে 1889 পর্যন্ত। এই সময়েই ইংরেজ ভূস্বামীর বিরুদ্ধে পৃথক বিদ্রোহ ঘটে সুন্দরবনে রহিমুল্লার নেতৃত্বে ও সন্দ্বীপে মুন্সী চাঁদ মিঞার নেতৃত্বে। 1872-73 সালের সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ নীলবিদ্রোহের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এরই ফলে কৃষকদের প্রথম সংগঠন তৈরী হয়, জমিদারি বিলোপের প্রথম দাবী ওঠে, এবং এর শেষ হয় সরকারের কাছ থেকে কিছু সংশোধিত বিধানের আদায়ের মাধ্যমে। এটা অর্থপূর্ণ যে বাঙ্গলায় 136 বৎসর ধরে যে চৌত্রিশটি কৃষকবিদ্রোহ ঘটেছিল, তার মধ্যে অন্ততঃ সতেরোটি বাংলাদেশেই কেন্দ্রীভূত ছিল, এমনকি সেগুলি সেখান থেকেই উদ্ভূত। এর মধ্যে অন্ততঃ চারটি এখান থেকে পূর্ব-ভারতের অবশিষ্টাংশে ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনের পেষণে দেশে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছিল। যেমন মোগলশাসিত ভারতভূমির বহু অঞ্চলে, তেমনি পলাশী-যুদ্ধপূর্ব বাঙ্গলায় উচ্চপদস্থ প্রশাসকগণ ছিলেন প্রধানতঃ মুসলমান ও অতি অল্পসংখ্যক হিন্দু। এই প্রশাসকগণ আবার সামন্ততান্ত্রিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিজাত ভূস্বামী ছিলেন। সেই সঙ্গে অনেক হিন্দু ক্ষুদ্র জমিদারও ছিল। প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন হিন্দু ছিলেন বণিক, মহাজন এবং ক্ষুদ্র জমিদার। ইংরেজ সর্বপ্রথমে এই অভিজাত প্রশাসকদের সরিয়ে নিজেদের লোক বসাল। নিম্নপদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের স্থানচ্যুত করা হল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণাম হল এই যে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর ভূসম্পত্তি নবজাত ধনী হিন্দু বণিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এইভাবে বপন করা হল সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রথম বীজ।

বাংলাদেশে মুসলমানদের একটা বিরাট সংখ্যা কৃষকশ্রেণীভুক্ত। এবারে তারা প্রধানতঃ হিন্দু জমিদারের অধীনে এল। নব্য রাজনীতির চাপে, ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যে যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাকে পরে একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র দেওয়া হয়। শহরেও জমিদার ও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের মধ্যে নবোদ্গত অর্থনৈতিক বিরোধ ইংরেজদের হস্তক্ষেপের ফলে সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করে।

স্থানচ্যুত মুসলমান ভূস্বামীগণ—যাঁরা মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা শ্রেণীভুক্ত—বহুদিনই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছলেন। এবার তাঁরা বিরসচিত্তে ইসলামের পুনরভ্যুদয় ও আরবী ও ফার্সী সংস্কৃতিতে আশ্রয় নিলেন। এইভাবে শুরু হল তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ-বিমুখতার প্রক্রিয়া। তাঁদের অর্থনৈতিক অবনতি ও জাতীয় প্রধান কর্মস্রোত থেকে অপসরণ, দুইয়ে মিলে এক মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত আবির্ভাবের পথরোধ করল। ইংরেজরা এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গেল 1880 সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাভাষাকে তদানীন্তন ফার্সী প্রভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে। বাংলাভাষাকে সুচিন্তিতভাবে সংস্কৃতশব্দবহুল করা সত্ত্বেও, মিশ্রিত ভাষা সগৌরবে বেঁচে রইল, বিশেষ করে বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে। কিন্তু ইংরেজপ্রদত্ত বিধান এই দুই সম্প্রদায় ও দুই বাংলার মধ্যে দূরত্ববোধের উৎপত্তি হয়ে দাঁড়াল।

অপর পক্ষে হিন্দু বণিক ও মহাজনদের সঞ্চিত পুঁজি ইংরেজের সুচিন্তিত নীতি অনুসারে কৃষিকর্মে নিয়োজিত হল। এইভাবে স্থানীয় শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগের উদ্যোগকে অতি সফল ভাবে টুঁটি টিপে মারা হল, এবং ইংরেজের পুঁজি ও শিল্পপণ্যের বাজার তৈরী হল। শিল্পোন্নয়ন করা হল সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। তারই ফলে, কলকাতা ও তার নিকটবর্তী জায়গাগুলি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠল, আর বাংলাদেশ রইল অবহেলিত, পিছনের সারিতে, তার কাজ হল শুধু পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলিকে কাঁচামালের যোগান দেওয়া।

নবজাত জমিদার পরিবারের ছেলেরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করল। এইভাবে গড়ে উঠল বাঙালী শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, প্রধানত হিন্দু বা 'ভদ্রলোক' যাঁদের মহত্তম অবদান ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় যুগ। ক্ষমতা বা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্করহিত এই শ্রেণীর মধ্যেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ধ্যানধারণা সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হয়। এবারে ইংরেজরা ওয়াহাবী-পরবর্তী এবং 1857-এর মুসলমান-বিতৃষ্ণা

পরিহার করে তাদের সহযোগিতা কামনা করল। উদ্দেশ্য : উদীয়মান জাতীয়তাবাদী প্রবণতার কণ্ঠরোধ করা, কারণ, কৃষক অভ্যুত্থানের প্রতি এর উন্মেষিত সহানুভূতির পরিচয় নীলবিদ্রোহের সময় পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ও সর্বভারতীয় স্তরে ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করলেন। এরই ধাক্কা এসে লাগল বাঙ্গলার ও বিশেষ করে বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের গায়ে।

ইংরেজ শাসনের যুগে কলকাতা, সারা বাঙ্গলার, এমনকি পূর্বভারতেরও রাজধানী বা প্রধান নগরীতে রূপান্তরিত হল। কলকাতা আকর্ষণ করত প্রত্যেক জেলা থেকে ছাত্রবৃন্দকে, কলকাতা শিক্ষক পাঠাত দেশের সর্বত্র। বঙ্গভঙ্গের স্বল্পকাল ছাড়া (1905-1911), মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের গর্ব ঢাকার আর কোন গুরুত্ব রইল না।

কৃষক সম্প্রদায় ছিল নীচু জাতের বা মুসলমান। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের অত্যন্ত হীন নজরে দেখত। বাংলাদেশের লোকসংখ্যার মধ্যে তাদের সংখ্যা ছিল বিরাট। শহরে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী যথেষ্ট গড়ে না ওঠায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রামবাংলায় যতটা সামাজিক যোগাযোগ ছিল নাগরিক জীবনে ততটা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। যতদিনে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ তৈরী হল, ততদিনে সরকারী শ্রেষ্ঠ চাকুরী আদায় করার সময় তাদের পার হয়ে গেছে। সংখ্যাধিক শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে তারা একটা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হল। ইংরেজ মুসলমানদের নিয়োগ করল পুলিশ ও জেলের চাকুরীতে, ও জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে (বেশীর ভাগই হিন্দু) তাদের ব্যবহার করতে লাগল। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পশ্চাৎপদ করে রাখার দরুণ সেখানকার মধ্যবিত্ত ছিল সংখ্যায় ক্ষুদ্র। হিন্দুরা—অধিকাংশই কলকাতার অধিবাসী—প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করছিল। এইভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল; এবং একটা সাধারণ জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হল।

উর্দু ভাষাভাষী অভিজাত শ্রেণী ঠিক সেই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক প্রচারে কর্ণপাত করে নি, এমনকি বাংলাদেশেও না। এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন 1906 সালে মুসলিম লীগের উদ্যোক্তা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ধরণের মানুষ। বরং কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, মাদারিপুর ও টাঙ্গাইলের মুসলমান অভিজাতরা দেশবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম ঢেউতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। 1906 সালের মাঝামাঝি

পর্যন্ত এই ব্যাপার চলে। বরিশাল নিয়ে এল তার নিজস্ব স্বদেশী চারণ কবি মফি-উদ-দীন বায়াতিকে। বগুড়ার নবাব ও চট্টগ্রামের বণিকরা স্বদেশী উদ্যোগে ব্রতী হলেন। মুসলমান রেলগাড়ীর চালকরা মহোৎসাহে 1907 সালে ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘটে যোগ দিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে নবাব সলিমুল্লার ভাই খাজা আতিকুল্লা দেশবিভাগ-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই যেখানে হয় বিরুদ্ধবাদী অথবা উদাসীন, সেখানে হাজার হাজার ছোট জমিদার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট ব্যবসায়ী, এবং শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ, বাংলাদেশে দেশবিভাগ-বিরোধী সংগ্রামে শামিল হন। কুমিল্লার এক ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, ইংরেজ শিক্ষাপদ্ধতির স্থলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভাবনা প্রথম তুলে ধরেন।

এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল, যে কৃষকসমাজ, বিশেষ করে বাংলাদেশে, প্রায় অস্পৃষ্ট ছিল। তার কারণ প্রধানতঃ এই, যে এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ও জমিদারদের একটা অংশ এতে যোগ দিয়েছিলেন। এই মূলগত দুর্বলতার ফলে, 1906 সালের শেষভাগে মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের পাল্টা প্রচার, বিশেষ করে বাংলাদেশে, জোরদার হতে শুরু করল। হিন্দু জমিদারের মুসলমান প্রজা হওয়ার দরুণ, পুরাতন সামন্ত অভিজাত শ্রেণী পরিচালিত জমিদারবিরোধী বক্তৃতার সমারোহ সহজেই সাড়া জাগাল। এই অভিযানের জমিদারবিরোধী মহাজনবিরোধী চরিত্র, সরকারের সক্রিয় উৎসাহদানে, শ্রেণী-বিরোধকে রূপান্তরিত করল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে। জাতীয়তাবাদের অভিযানে ক্রমবর্ধমান হিন্দুধর্মের প্রভাব মুসলিম-পূর্ব অতীত ও ঐতিহ্যের উপরে জোর দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও তিক্ত হয়ে উঠল। ইংরেজ ও পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধ্যে হিন্দুধর্মের অতীত গৌরব ও স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতার পুনরাবিষ্কার সম্পর্কে আকস্মিক অনুরাগ এই হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়কে আরও শক্তিশালী করে তুলল। বিচার করে বলা কঠিন, এই বিদগ্ধ প্রচেষ্টা কতটা নিঃস্বার্থ ছিল, ও ইংরেজ শাসকরা তার কতখানি সুযোগ নিয়েছে। সে যাই হোক, এই কারণগুলো একটা অবিচ্ছেদ্য বাঙালী সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মোহমুক্ত করতে সাহায্য করেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্নতা, ও ইসলামী পশ্চাৎমুখিতাকে উৎসাহদানে সচেতন ইংরাজ নীতি, বাঙ্গলার এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের কেবলই পিছিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।

এই পরিস্থিতি, অভিজাত, জাতীয়তাবোধ বিরহিত, উর্দু ভাষাভাষী উচ্চশ্রেণীর

মুসলমান ও অন্যান্য বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে দূরত্বকেও বেশ কিছুদিন ধরে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করল। একটা সাধারণ ভাষা, কৃষ্টি ও জাতীয়তাবাদের উচ্চাশা শুধু মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটা ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে বেঁচে রইল। স্বর্ণাক্ষরে যাঁদের নাম লেখা যায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মীর মুশারফ হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলাম। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বিশের দশকে, ও পরে কিছুদিনের জন্যে এ. কে. ফজলুল হক। বিভিন্ন ধর্ম-নিরপেক্ষ দলে অন্যদের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সংখ্যায় তারা অল্প। শহরের হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত যুবকদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ না থাকায় ও বিপ্লবীদের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রতীক সম্পর্কে অন্ধ প্রীতির দরুণ ধর্মনিরপেক্ষ দলে মসলমান যুবকদের যোগদানে বাধাসৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, অসহযোগ আন্দোলনকাল যখন প্রায় শেষ, সে সময় চিত্তরঞ্জন দাস খিলাফৎ আন্দোলনের অনুবৃত্তি হিসেবে, উভয় দলের পক্ষে স্বীকার্য সূত্রের ভিত্তিতে, দুই সাম্প্রদায়িক দলের বর্তমান সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনি মারা যাবার পরে এই প্রচেষ্টা আর অনুসৃত হয়নি।

এ. কে. ফজলুল হক, তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টি নিয়ে কিছুদিন উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকসমাজের ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন বটে, কিন্তু উন্নাসিক বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সমর্থন তিনি জয় করতে পারলেন না! শেষ পর্যন্ত তিনিও গিয়ে হাজির হলেন মুসলিম লীগে, যদিও কোনওদিনই সেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বস্তি অনুভব করেন নি। 1940 সালে, মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে তাঁকে দিয়ে পাকিস্তানের প্রস্তাব উত্থাপন করা হল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বাঙ্গলার পক্ষে অগ্রসরমান জাতীয় রাজনীতির চাপকে এড়ানো অসম্ভব এবং দেশবিভাগ অবশ্যম্ভাবী। আর একবার এই পর্যায়ে বাঙ্গলার সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান শেষ বেপরোয়া ঝোঁকে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করল।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, জাতীয় নেতারা যখন ক্ষমতার প্রসাদ বণ্টন নিয়ে কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী। জমিদারদের বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক মতানৈক্যকে ছাপিয়ে সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। আর একবার ময়মনসিং-এর গারো এবং হাজংরা তাদের প্রিয় নেতা মণি সিংয়ের নেতৃত্বে, বিদ্রোহে ফেটে পড়ল। রেলপথ ও চা-বাগানের শ্রমিকরা কৃষকদের সংগ্রামী সংগঠনের কাজে সাহায্য করলেন; কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্থাপিত হল। ছাত্রদের সঙ্গে মিলে তাঁরা রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহের সহায়তার আহ্বানে এগিয়ে এলেন। আই. এন. এ.-র বন্দীমুক্তি ও ভিয়েৎনাম থেকে ভারতীয় সৈন্যের অপসারণ দাবী করে, ছাত্ররা কলকাতার রাস্তাকে রণক্ষেত্র বানিয়ে ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেছে। এবং সবশেষে, 1946-এর 29 জুলাই, ডাক-তার কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সমর্থনে সারা কলকাতা শহরকে জনগণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। জাতীয় ঐক্যের, একনিষ্ঠ বৈপ্লবিক চেতনার ও নিরস্ত্র অথচ সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের শক্তির এ এক অপূর্ব নিদর্শন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গলার এই শেষ বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ, মাত্র উনিশ দিন পরে, 16 অগাস্ট, ভ্রাতৃহত্যার রক্তবন্যায় নির্বাপিত হল। সাম্প্রদায়িক বৈরিতা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, গভীরতম প্রদেশে ছড়িয়ে গেল। গান্ধীজীর একক নোয়াখালি পরিক্রমাও সমন্বয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারল না। ভারতীয় উপ-মহাদেশ এবার, যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত এক অতি শয়তানী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের জালে জড়িয়ে গেল।

তা সত্ত্বেও, রাজনীতির ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র বোস ও বাঙ্গলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এইচ. এস. সুরাবর্দী প্রাণপণ চেষ্টা করলেন প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনের নামে, সাধারণ কৃষ্টি, ভাষা ও দেশের উপরে প্রতিষ্ঠিত জাতিসমূহের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছিল অতি সফলভাবে। বরঞ্চ, বিভক্ত করে শাসন করার নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলিকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে ভাগ করার অদ্ভুত নিয়মের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল। শ্রেণী এবং অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে নিপুণভাবে সাম্প্রদায়িক বিবাদে রূপান্তরিত করা হল।

সুতরাং ভারতবিভাগ, ও বিশেষ করে 1947 সালের বঙ্গবিভাগ, মূলতঃ বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাতহেতু নয়, তার আসল কারণ অর্থনৈতিক বৈপরীত্য ও তার বিকৃত রাজনৈতিক রূপ। খ্যাতিমান সমকালীন বাংলাদেশী লেখক হাসান হাফিজুর রহমান স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে বাঙ্গালী সংস্কৃতি কখনও প্রাক-বঙ্গবিভাগ যুগের উন্মত্ততার স্রোতে গা ভাসায়নি। দেশবিভাগের বীজ রোপনের ইতিহাস বহু পুরাতন। কেবলমাত্র সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরই এই অবস্থা নিবারণ করতে পারত।

যদিও ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং বিশেষ করে বাঙ্গলায়, এমন একটা বিপ্লবের জন্যে বস্তুগত পরিস্থিতি প্রস্তুত ছিল, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সংগঠিত ছিলেন না, এবং

সেই প্রবর্তনাকে সবলে মূর্ত করার মত তাঁদের ক্ষমতা ছিলনা। বাংলাদেশী লেখক বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম লীগ বঙ্গবিভাগ চায়নি। তার চিন্তাধারায় ছিল যে, ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গলা, পাকিস্তান বা ভারত, যেখানেই যুক্ত থাকুক, বা স্বাধীন থাকুক, তাতে মুসলমান সংখ্যাধিক্য থাকবেই। কিন্তু কংগ্রেস বিভাগের উপরেই জোর দিল, এবং ঠিক যে-কারণে লীগ পাকিস্তান চেয়েছিল, সেই কারণেই, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর একটা কথা ভুললে চলবে না যে, বিবদমান কোন পক্ষই কলকাতাকে হাতছাড়া করতে রাজী ছিলনা ; তার কারণ পূর্বাঞ্চলে কলকাতা ছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র, ও সারা উপমহাদেশে সবচেয়ে শিল্পায়ত নগরী। বিভাগের দরুণ পূর্বপাকিস্তান একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি হারাল, ও বুদ্ধিজীবীরা হারালেন তাঁদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সহজ প্রবেশাধিকার। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের উপরে এসে পড়ল বাস্তুহারা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা, ও তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা যার সমাধান আজও সুদূর। □

ছয়

মোহভঙ্গ

আমার ক্ষ্যাতে ভাইরে যখন
নোনাপানি আসে
সোনার ফসল যখন আমার
বাণের জলে ভাসে
দেশদরদী লীগের নেতা
তখন তিনি কন না কথা
আর মরুভূমির নুন সরাইতে
সবার আগে সে ধায়।
এই মরুভূমি করতে আবাদ
বানছে নতুন বাঁধ।
পিণ্ডিতে দেয় টাকার পাহাড়
নাম ইসলামাবাদ।

—রায়ান বয়াতি (অগাস্ট, 1964)

অতীতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করত কৃষি ও কারিগরদের নৈপুণ্যের উপরে। সুদূর অতীত থেকে মোগলদের সময় পর্যন্ত তার সুতি বস্ত্রশিল্পের সুনাম ছিল জগৎ-জোড়া। ঢাকা 28 লক্ষ টাকা মূল্যের মসলিন রপ্তানী করেছে 1753 সালে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, এই তিন নদীবেষ্টিত 6,000 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে 1841 সালে 4,000 তাঁত ছিল। বাংলাদেশ রেশমও রপ্তানী করত।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বাংলাদেশ দ্রুত কাঁচামালের ঘাঁটিতে পর্যবসিত হল। পুরোন স্বনির্ভর অর্থনীতি, যেখানে খাদ্য, বাণিজ্যিক কৃষি ও হস্তশিল্পের মধ্যে একটা ভারসাম্য ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেল। গুরুত্ব দেওয়া হল বাণিজ্যিক শস্যের উপরে, যথা তামাক, কমলালেবু, কফি, চা, আখ, জাফরান, তুলো, পাট, নীল এবং ধান।

পুরোন কারিগরি শিল্পের জায়গায় নতুন কোন যন্ত্রশিল্প স্থাপন করা হল না। ফলে জমির উপরে চাপ পড়ল বেশী। শেষপর্যন্ত, কৃত্রিম রং-এর বিকাশ হওয়ার সঙ্গে, বাংলাদেশে প্রধান বাণিজ্যিক ফসল দাঁড়াল পাট।

দেশবিভাগের সময়, পাকিস্তানের দুটি খণ্ডেই অর্থনৈতিক ভাবে মোটামুটি একই অবস্থা ছিল। উভয়েই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল পশ্চাৎপদ শিল্প। বাংলাদেশে ছিল মাত্র দশটি সুতাকল, 49টি পাট বাণ্ডিল করার যন্ত্র, 58টি ছোট চালকল, তিনটি চিনির কারখানা ও একটি সিমেন্ট কারখানা। তামাক, পাট, গম, চা, পশুচর্ম ইত্যাদি কাঁচামালকে শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তর করার কোন নিজস্ব কারখানা ছিল না। বাংলাদেশের নদীভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাকেও কাজে লাগানো হয়নি।

এর চেয়েও বেশী দুঃখের কথা এই যে, বাংলার অন্যান্য অংশ থেকে আকস্মিক বিচ্যুতির দরুণ বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল। প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করার জন্যে তাকে বিদেশে পাট রপ্তানী করতে হল। কলকাতার ইস্পাহানীরা ছাড়া, ভারতীয় উপমহাদেশ বহির্ভূত এই নতুন দেশের পূর্বাঞ্চলে কোন মুসলমান শিল্পপতি গেল না। জমিদারদের বেশীর ভাগ ছিল হিন্দু। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত উচ্চশ্রেণীভুক্ত হিন্দুরা স্থান ত্যাগ করায় একটা শূন্যগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে 133 জন সভ্য পাকিস্তানে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র একজন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা ছিল সারা পাকিস্তানের মধ্যে বৃহত্তম, বিশিষ্ট, সংস্কৃতিসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী, ও সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা 55 ভাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অসামরিক সরকারী উচ্চপদে, সামরিক বাহিনীতে, বিভিন্ন পেশায় ও ব্যবসাক্ষেত্রে তার সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ভারত থেকে মুসলমান ব্যবসায়ীরা চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। এর ফলে, একেবারে প্রথম থেকেই, পূর্ববাংলাকে তার সমস্ত প্রয়োজনের জন্য দেশের পশ্চিম অংশের উপর নির্ভর করতে হল।

পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে যে রাজনৈতিক নেতারা গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের কোন প্রভাব ছিল না। পাকিস্তানের জন্যে আলাপ আলোচনা কালে মহম্মদ আলি জিন্না বেশীরকম নির্ভর করেছিলেন অসামরিক সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উপরে। পাকিস্তান গঠনের অব্যবহিত পরে অস্ত্রের জোরে কাশ্মীর দখলের একটা প্রচেষ্টা হয়। এইসব ঘটনার ফলে সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র কিছুটা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

দেশান্তরী রাজনৈতিক নেতাদের কোন গণভিত্তি না থাকায় জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁরা ভীত হলেন। সেইজন্যেই তাঁরা মোটামুটি একটা সমঝোতা করলেন একদিকে স্থানীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে ও অন্যদিকে অসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে। এইভাবে একটা মৈত্রীবন্ধনের ভিত্তি স্থাপিত হল, যার মধ্যে ব্যবসায়ী শ্রেণীও ছিল।

পূর্বদিকে রাজনৈতিক অবস্থা কিন্তু উল্টো পথে এগোল। চল্লিশ সনে যাঁরা মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন, জনগণের মধ্যে তাঁদের একটা ভিত্তি আগে থেকেই ছিল। তাঁদের ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ফজলুল হক ও এইচ. এস. সুরাবর্দী তাঁদের নিজেদের জোরেই নেতা ছিলেন। আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তাঁদের মৈত্রীর কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং তা সম্ভবও ছিল না, কারণ সেখানে কর্তৃত্বপদে বেশীর ভাগই অবাঙালী। সেখানে কোন স্থানীয় শিল্পপতিও ছিল না। পূর্ববঙ্গে বাঙালী রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান বনিয়াদ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকসমাজ।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জটিলতা, এবং গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পার্থক্য ছাড়াও পাকিস্তানের দুই অংশের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ, একজাতিসুলভ বন্ধন রচনার পক্ষে বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করল। পূর্ববঙ্গের চা এবং পাট বেচে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা পশ্চিম অংশের নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর কাছে পুঁজি সঞ্চয়ের পথ খুলে দিল। তাছাড়া তাদের তৈরী পণ্যদ্রব্যের একটা বাজার পাওয়া গেল পূর্বাঞ্চলে। এর ফলে ঔপনিবেশিক সম্পর্ক সৃষ্টির সহজাত প্রবৃত্তিও একজাতিত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতি, বাংলাদেশে স্থানীয় শিল্পপতিগোষ্ঠী গড়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করল। কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক পদ্ধতি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করল, তা অনিবার্যভাবে জাতীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকে জনসমর্থনের অধিকারী বাঙালী রাজনৈতিক নেতাকে বাতিল করে দিল। ফজলুল হক বা সুরাবর্দীর মত লোক কেন্দ্রীয় সরকারে স্বল্পমেয়াদী কর্মজীবনের পরে অনুগামীদের আস্থা হারালেন। পূর্বাঞ্চলে যতবারই কোন বিরোধীদলীয় সরকার গড়ে উঠেছে, তখনই তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। তার বিশেষ কারণ, পাকিস্তানের নব্য শাসকগোষ্ঠীর বাংলাদেশে একটা স্থায়ী সামাজিক বুনিয়াদ গড়ার অক্ষমতা।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে যে অসম বিকাশ ঘটে, কয়েকটি অর্থনৈতিক উদাহরণে তা পরিষ্কার ফুটে ওঠে। স্বাধীনতার পরে প্রথম দশ বৎসর পশ্চিম অংশে জনপ্রতি আয় 330 টাকা থেকে 373 টাকা বৃদ্ধি পায়; বাংলাদেশে

তা কমে দাঁড়ায় 305 টাকা থেকে 288 টাকা। শিল্পের বিকাশ ও শিল্পের সহায়তাবাচক উপকরণের উন্নতি অতি নিম্নস্তরে থেকে যায়। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার হার কমে যায়। বাংলাদেশে লোক বলত, 'গ্রামে পাকা বাড়ী দেখলে বুঝবে ওটা স্কুলবাড়ীর চেয়ে মসজিদ হবার সম্ভাবনাই বেশী।' উচ্চশিক্ষার বৃদ্ধির হার পশ্চিমে যেখানে শতকরা 38 বাংলাদেশে তার বৃদ্ধি মাত্র শতকরা 11.2 ; অর্থনৈতিক বিকাশ ও অন্যান্য কাজের জন্য নির্ধারিত তহবিলের দুই-তৃতীয়াংশ খরচ করা হত পশ্চিমে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী সাহায্য বাংলাদেশ পেত মাত্র শতকরা 17 ভাগ, ও মার্কিন পণ্যসাহায্যের শতকরা 30 ভাগ। পশ্চিমে শিল্পবিকাশকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করা হত, অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতি, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, আমদানী লাইসেন্স ও পুঁজি বিনিয়োগ ব্যবস্থা দিয়ে। বাংলাদেশের অনুন্নত, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার দরুণ পাকিস্তানের দুই অংশে পারস্পরিক বাণিজ্যে যে ঘাটতির সৃষ্টি হত, তা পূরণ করা হত এইভাবে : চা এবং পাট রপ্তানীর দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বাংলাদেশের অর্জিত উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রার একটা মোটা অংশ পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়া হত।

জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক একনায়কত্বের সময় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত করা হয়। তাঁর বিকাশ পরিকল্পনা দশক-এর সময়েই পাকিস্তানে 'বিংশতি পরিবার'-এর উদ্ভব হয়। এঁরা সমগ্র শিল্পসম্পদের শতকরা 60 ভাগ ও ব্যাংকের সম্পদের শতকরা 80 ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। যে দেশে বিভিন্ন ও যথেষ্ট সুগ্রথিত রাষ্ট্রজাতির বসবাস, সেখানে এক পাঞ্জাবী শাসক সম্প্রদায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল সামন্ত জমিদারদের সঙ্গে জড়িত পুঁজিপতিরা। এদের মধ্য থেকেই সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উচ্চপদভুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত হত। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার সূত্রে এই শাসকশ্রেণী গ্রামাঞ্চলে আংশিক ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সৃষ্ট ধনী কৃষকশ্রেণীর মধ্যে একটা নতুন সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করল। 'বেসিক ডেমোক্রেসি'র ব্যবস্থার মাধ্যমে এই গণভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করা হয়। 'বেসিক ডেমোক্র্যাট'দের হাতে অবাধ পুঁজি ঢালা হত গ্রামোন্নয়ণের কাজের জন্যে। এই সব পন্থা গ্রহণ করে আয়ুব ক্ষমতার কাঠামোটার আমূল পরিবর্তন করলেন, ও সাবেকী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান করলেন। এতে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের চেয়ে পূর্বাংশেরই বেশী ক্ষতি হল। জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে পূর্ববঙ্গের সদস্যদের মধ্যে 1965 সাল নাগাদ, শতকরা অন্ততঃ বত্রিশ জন সভ্য ছিল ব্যবসায়ী, কারখানার

মালিক ও ঠিকাদার। যেখানে 1947 থেকে 1958-এর মধ্যে এদের সংখ্যা ছিল শতকরা চারজন।

আয়ুবতন্ত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিরও বিরাট পরিবর্তন হয়। প্রাক-1947 সালের জমিদারী প্রথা বিলোপের পরে ক্ষুদ্র কৃষক মালিকানার উদ্ভব হয়। ভূমিবন্টন ও মালিকানার মধ্যে যে বৃহৎ বৈষম্য ছিল, আয়ুব রাজত্বে এক নতুন ধনী গ্রামীণ শ্রেণী তৈরী হওয়ায়, তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রামোন্নয়ণের জন্য সরকার প্রদত্ত অর্থের জোরে এই 'বেসিক ডেমোক্র্যাট'রা, এক বিরাটসংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি আত্মসাৎ ক'রে, প্রথমে সুদখোর মহাজন ও অবশেষে ধনী ভূস্বামী হয়ে ওঠে। এবং কৃষকরা পরিণত হয় ভূমিহীন চাষী বা ভাগচাষীতে।

পূর্বাঞ্চলের স্বার্থে আর্থিক সংস্থান পুনর্বণ্টনের একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ ও বৈদেশিক সাহায্যে পূর্বাংশের ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহদানের জন্য সরকারী আর্থিক নীতি পশ্চিম-ঘেঁষাই থেকে যায়। 1963 থেকে 64 এবং 1965 থেকে 66 সালে পাকিস্তানের সামগ্রিক বেসরকারী বিনিয়োগের শতকরা মাত্র 22টি পূর্বদিকে যায়। কেন্দ্রীয় ঋণদান সংস্থাগুলিও ঋণ দেওয়া সম্পর্কে এই ধরণের বৈষম্য বজায় রাখে। তার ফলে উনত্রিশটি শীর্ষস্থানীয় শিল্পের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে মাত্র দুইজন পুঁজিপতি পাওয়া যায়, যাঁদের অবস্থান তালিকার একেবারে শেষে। গ্রামোন্নয়ণের জন্য নির্ধারিত 67.16 কোটি টাকার অধিকাংশই 1962–63 এবং 1966–67 সালে বাংলাদেশে রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যয়িত হয়। এটা করা হয় সামরিক প্রয়োজনে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুরোপুরি মুদ্রার ব্যবহার চালু হয়, এবং সমৃদ্ধ গ্রামবাসীরা উপকৃত হয়।

মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য, জীবনধারণের ব্যয়ের তালিকা, আসল মজুরি, মাথাপিছু অর্থনৈতিক উন্নতি, দেশের সার্বিক আয়ের মধ্যে উৎপাদনশিল্পের অংশ, আন্তঃ-প্রাদেশিক বাণিজ্যে অর্থের ঘাটতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত, এ সবই বহুবিঘোষিত 'আয়ুব দশক'এও একই অবস্থায় ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় উচ্চতর অর্থ নির্ধারণ সত্ত্বেও কার্যতঃ বণ্টনের শতকরা হিসাবের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করার জন্য ব্যবহৃত হত, যার ফলে আবার সেই অঞ্চলে অর্থনিয়োজনের সুযোগ বেড়ে যেত। পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলাদেশে অর্থনিয়োজনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল পাট, সুতির বস্ত্র, কাগজের কল, ব্যাংক ও

জীবনবীমায়, এবং আদমজী গোষ্ঠীর মোটরগাড়ীর কারখানাতে। অপর পক্ষে, বাংলাদেশে হয়ে দাঁড়াল পশ্চিম পাকিস্তানের বাধ্যতামূলক বাজার। পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বিক—আঞ্চলিক ও বৈদেশিক—রপ্তানীর প্রায় শতকরা 50 ভাগের বাজারই ছিল বাংলাদেশ। এইরকম অসম বাণিজ্য বণ্টন ব্যবস্থার ফলে বছরে প্রায় 20 কোটি ডলার বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হত।

সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিনির্ভরই থেকে গেল, ও লোকসংখ্যা ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির উপরে বেশী চাপ পড়তে লাগল। অতি উর্বর জমি হওয়া সত্ত্বেও, যথেষ্ট সেচ ও জলনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, বিদ্যুতের স্বল্প বিকাশ ও পরিকল্পনাবিহীন রেলপথ ও রাস্তার বাঁধ নির্মাণের ফলে, হেক্টার প্রতি ফসলের পরিমাণের কোন বৃদ্ধিই হয়নি। ফলা চলে রেলপথ ও রাস্তার বাঁধগুলি প্রাকৃতিক জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা উপেক্ষা করে তৈরী করায়, কিছু নদনদীর মজে যাওয়া ত্বরান্বিত হল, অন্য নদনদী পলিমাটি বেড়ে বন্যায় ভেসে গেল। কিছুটা নতুন প্রকৌশলের ব্যবহার সত্ত্বেও কৃষি নির্ভর করে রইল আবহাওয়ার দয়াদাক্ষিণ্যের উপরে।

1970 সাল নাগাদ বাংলাদেশে শিল্পের সংখ্যা ছিল 3000-এর কিছু বেশী। এর মধ্যে বেশীর ভাগই হয় স্থিতিশীল অথবা দুর্দশাগ্রস্ত। বেড়ে চলেছিল শুধু শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উৎপাদন। বাংলাদেশে গ্যাসের কোন অভাব নেই। গ্যাস ছাড়া, অন্য কোন খনিজ পদার্থ, যথা চূণ, কয়লা, কাদামাটি ও তেজস্ক্রিয় খনিজ ধাতু কাজে লাগানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি।

1971 সালের নির্বাচনে কঠোর সংগ্রামের শেষ পরিণতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সেই নির্বাচনে ব্যবহৃত একটি প্রাচীরপত্র, পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চল পূর্বাঞ্চলকে যেভাবে শোষণ করছে, তার একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অল্পকথায় তুলে ধরেছে, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' এই শিরোনামায়।

1. কেন্দ্রীয় বার্ষিক আয় থেকে পূর্বাঞ্চল পায় 1,500 কোটি টাকা, পশ্চিমাঞ্চল পায় 5,000 কোটি টাকা।

2. উন্নয়ন খাতে পূর্বাঞ্চলের ব্যয় 3,000 কোটি টাকা, পশ্চিমাঞ্চলের ব্যয় 6,000 কোটি টাকা।

3. বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা 20 ভাগ পূর্বাঞ্চলের বরাদ্দ, আমদানীর পরিমাণ সমস্ত বিদেশী পণ্যের শতকরা 25 ভাগ।

4. কেন্দ্রীয় কর্মবিভাগে পূর্বাঞ্চলের অংশ শতকরা 15 ভাগ ও সামরিক বাহিনীতে শতকরা 10 ভাগ।

5. পূর্বাঞ্চলে চাউলের দাম মণ প্রতি 50 টাকা, পশ্চিমে মাত্র 25 টাকা।
6. পূর্বাঞ্চলে সরিষার তেল সের প্রতি 5 টাকা, পশ্চিমে 2.50 টাকা।
7. পূর্বাঞ্চলে 90 রতি সোনার দাম 170 টাকা, পশ্চিমে 135 টাকা।

অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে সমান তালে ছিল সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে অবহেলা। পাকিস্তান গঠনের সময়ে বাংলাদেশে সাক্ষরতার, প্রবেশিকায় উত্তীর্ণের ও বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুর সংখ্যা পশ্চিম অংশের চেয়ে বেশী ছিল। বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়ের সংখ্যা 1970 সালে দ্বিগুণ হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে গেল। স্বভাবতঃই প্রবেশিকায় উত্তীর্ণের সংখ্যা শতকরা প্রায় 50 ভাগ, স্নাতকের সংখ্যা শতকরা 32·3 ভাগ ও স্নাতকোত্তরের সংখ্যা শতকরা 12 ভাগ কমে গেল। বেশীর ভাগ বৃত্তি বা অনুশীলনের জন্য ধার্য অর্থ যেত পশ্চিমে, কারণ 16টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানেই ছিল 13টি। এই বৈষম্য ও শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাৎপদ অবস্থা সত্ত্বেও, বাংলাদেশে সাক্ষরতার সংখ্যা পাকিস্তানের বাকী অংশের চেয়ে বেশী। অবস্থা যে কতখানি করুণ, তার প্রমাণ বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনের নিম্নমুখী গতি—1950 সালে, ভাষা আন্দোলনের উত্তুঙ্গে 1,356 আর 1969 সালে মাত্র 381টি।

এত বাধা সত্ত্বেও বাংলাদেশে, বিশেষ করে 'আয়ুব দশক'-এ একটা শক্তিশালী, পূর্ণাবয়ব, উচ্চাকাংখী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল। এই শ্রেণীই পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিল এই আশায় যে, সে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অভিজাত বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু সে অতি সত্বর আবিষ্কার করল যে বেসরকারী ও সামরিক আমলাতন্ত্রের উঁচু ধাপগুলো তার নাগালের বাইরে। এমনকি 1966 সাল পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় মহাকরণে প্রথম শ্রেণীর কর্মসচিবদের শতকরা 30 ভাগেরও কম ছিল বাংলাদেশের ভাগ্যে, নির্ধারিত আনুপাতিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও। সামরিক বাহিনীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব তখনও 1950-র দশকের মতই স্বল্প। দুটি পৃথক প্রদেশকে বিলুপ্ত করে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুটি বিভাগ সৃষ্টি হওয়ায়, বাংলাদেশীরা একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারল—জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ, এবং বেসরকারী ও সরকারী কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও উন্নয়ন তহবিলের বৃহত্তর অংশের দাবী থেকে তাদের চতুরভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আয়ুব পূর্ব পাকিস্তানের নতুন রাজধানী তৈরী করা শুরু করলেন ঢাকায়। কিন্তু এবারে বাংলাদেশীরা আর উচ্ছিষ্টের ভগ্নাংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নয়। তারা

জানত যে মরুভূমিতে প্রাণসঞ্চার করে করাচীর প্রথম রাজধানী নির্মাণে ব্যয় হয়েছে কুড়ি কোটি টাকা। আবার ইসলামাবাদে নতুন রাজধানী তৈরী করতেও সমপরিমাণ অর্থ পুনরায় ব্যয় করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঢাকার জন্যে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ মাত্র দুই কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধি গড়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তানের দারিদ্র্যের মূল্যে।

বাংলাদেশের মানুষ বুঝল যে, বাঙলার হিন্দুদের আধিপত্যের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যের কবলে পড়েছে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যথা পেশাদারী, আমলা, সামরিক কর্মচারী, ছোট ব্যবসায়ী—দেখল, তাদের কল্পনার সৌধ ভেঙে চুরমার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে শহরবাসের অভ্যাস তখনও নতুন, তার নাড়ীর দৃঢ় বন্ধন গ্রামের সঙ্গে। তার মোহমুক্তি ও উচ্চাকাংক্ষা সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের অসন্তোষের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। কারণ অসম আচরণের আসল বোঝাটা বহন করতে হয়েছিল সাধারণ কৃষক শ্রেণীকেই। এইভাবে স্থাপিত হল স্বায়ত্তশাসনের দাবীর অর্থনৈতিক ভিত্তি। এরই শেষ পরিণতি স্বাধীনতার সংগ্রাম। □

সাত

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশে মানে হিত অতি
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুড়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায় ॥

—সন্দ্বীপের আবদুল হাকিম রচিত 'নূরনামা' (অষ্টাদশ শতাব্দী)

পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম ছিল রাজনৈতিক আত্মনির্ভরতার অধিকারের ঘোষণা। যদিও কিছুটা বিকৃত অর্থে, কারণ ধর্মকে রাষ্ট্রজাতির প্রতীতির সঙ্গে একীভূত করা হয়েছিল। সংগ্রাম অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে, প্রধান গুরুত্ব নিল স্বভাবতঃই মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনির্ভরতার প্রশ্ন। বাঙালী মুসলমান যখন পাকিস্তানের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল, তখন খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতির গূঢ় তাৎপর্য নিয়ে বেশী মাথা ঘামায়নি। দুই নবজাত রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এই সংস্কৃতি, এক ইতিহাস, ভাষা, ঐতিহ্য ও রীতির অন্তর্নিহিত। এতকাল ধরে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে একেই তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল।

উৎসাহের প্রথম আতিশয্যে মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীর মনে হল, বহু শতাব্দী পরে এই প্রথম আত্ম-অভিব্যক্তি ও অর্থনৈতিক প্রগতির একটা সুযোগ তার সামনে উপস্থিত হল। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝতে পারল যে তাদের আত্মপরিচয়ের অনেক উপাদানই তারা ফেলে এসেছে কলকাতায়, যে-কলকাতা বাঙলার প্রাণকেন্দ্র ছিল গত প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। প্রথম উচ্ছ্বাসে, সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করা হল বাঙালী মুসলমানের উগ্র ইসলামপ্রীতি জাগিয়ে। তার একটা প্রকাশ পরিলক্ষিত হল স্ত্রী ও পুরুষের বেশ পরিবর্তনে। ধুতি এবং শাড়ী প্রায় অদৃশ্য হল।

তার জায়গায় এল চুড়িদার, সালোয়ার আর ঘেরারা। লোকরীতি ও লোকাচার পরিত্যক্ত হল।

এই পাকিস্তানী পরিচয়ের অনুসন্ধান, বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের দুই বিপরীত লক্ষ্যের দ্বন্দ্বে ফেলে দিল : নতুন নগরসভ্যতা বনাম প্রাচীন গ্রাম্যতা ও সর্বোপরি, দেশজ সংস্কৃতি ও পশ্চিম এশিয়ার পবিত্র দেশের ইসলামী উত্তরাধিকারের মধ্যে পুরাতন বিরোধ।

এককালে লর্ড কার্জন যেমন বুঝেছিলেন, পাকিস্তানের নতুন শাসকশ্রেণীও তেমনি হৃদয়ঙ্গম করল যে, জাতীয়তাবাদের প্রখর চেতনাসম্পন্ন বিস্ফোরণপ্রবণ বাঙালীকে যদি রাশে রাখতে হয়, তবে যতদূর সম্ভব তাকে পাকিস্তানের মধ্যে মিশিয়ে ফেলতে হবে। তার স্বাতন্ত্র্যকে পাকিস্তানী হওয়ার নতুন প্রতীতির মধ্যে বিলুপ্ত করে দিতে হবে। এই বাধ্যতামূলক সমপ্রকৃতির প্রথম দাবী হল, বাংলা ভাষার স্থান গ্রহণ করবে সমগ্র দেশের জন্যে একটা সাধারণ ভাষা। সে ভাষা উর্দু। জিন্না যে কঠোর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন, তার জন্যেও উর্দু একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হল। সুতরাং পূর্ববাংলার মানুষকে পুরাতন সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হল, ও হিন্দুদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ মুছে দিতে হল।

এইভাবে পাকিস্তানের দুটো অসম অংশকে একত্রে ধরে রাখার জন্যে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির নীতি রূপায়িত হল। জাতীয় একীকরণ এ-নীতির লক্ষ্য ছিল না, বরং বাঙালীকে অখণ্ড পাকিস্তানী জাতীয়তার অঙ্গীভূত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টার ফলে উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীর একটা ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে চৈতন্যের উদয় হল যে, সাংস্কৃতিক আত্মনির্ধারণে ভাষারও একটা ভূমিকা আছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্ণ হবার আগেই বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, কারণ তারাই সর্বাগ্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাদের আশা ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষা পাবে, প্রথমেই একটা বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে নয়। কিন্তু জিন্না স্বয়ং তাদের বললেন যে, উর্দুই জাতীয় ভাষা।

এবারে ভাষা রূপান্তরিত হল পরিচিতির প্রতীকে। 1951-এর আদমসুমারি অনুসারে পাকিস্তানের লোকসংখ্যার শতকরা 54.6 জন বাংলা ভাষাভাষী। অপর পক্ষে উর্দু আসলে পাকিস্তানের নিজস্ব ভাষা নয়। পাকিস্তান আন্দোলনের অংশ হিসাবে একটা সাংস্কৃতিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য এই ভাষাকে কৃত্রিমভাবে প্রক্ষেপ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের কাছে উর্দু নিঃসন্দেহে পরিচিত ভাষা হলেও, সোজাসুজি বলতে গেলে, পাকিস্তানের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা

পাঁচজনেরও বেশী লোকের মাতৃভাষা নয়। এদের মধ্যে আবার অধিকাংশই ভারত থেকে দেশান্তরিত।

বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী, বেশীর ভাগই প্রথম প্রজন্মের শহরবাসী। শহর ও গ্রামের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁদের জন্ম। যে ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনের পুরোধা ছিল, তারা ছোট ব্যবসায়ী, কৃষক ও পেশাদার ঘরের ছেলে। উর্দু, আত্মপরিচয়ের উপরে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াও, গুরুতর আর্থিক সমস্যার অবতারণা করেছিল, কারণ উর্দু জাতীয় ভাষা পরিগণিত হলে, অন্য ভাষাভাষী যুবকদের সরকারী চাকুরীর প্রতিযোগিতায় অগ্রবর্তী হওয়ার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করবে।

নতুন, ক্রমবর্ধমান প্রশাসনের প্রয়োজনে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। পূর্ববাংলার প্রশাসন বিভাগে অন্ততঃ নিম্ন ও মধ্য সারিতে তাদের স্থান দিতে হয়েছিল। এমনিতেই, বাঙালীর জাতিগত ও সাংস্কৃতিক একত্বকে দুর্বল করার জন্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু ভারত-উদ্বাস্তু বিহারীদের বসতি স্থাপন করা হয়েছিল। বিহারীদের জন্যে ইতিপূর্বেই কিছু চাকুরী সংরক্ষিত ছিল। আরো বেশী উস্কানি এল উর্দু বর্ণমালা ঢোকানোর চেষ্টায়, বাংলা ভাষার মধ্যে সংস্কৃতভিত্তিক শব্দের জায়গায় আরবী বা ফার্সী শব্দ ঢুকিয়ে তাকে ইসলামী চরিত্র দেওয়ায়, এবং সমস্ত হিন্দু লেখক রচিত সাহিত্যের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করায়।

লোকে বুঝতে আরম্ভ করল যে আসলে তাদের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়টাকে ধ্বংস করাই লক্ষ্য। সেটা যদি সফল হয়, তবে তাদের সামাজিক জীবন পঙ্গু হয়ে যাবে। প্রিয়জনের কাছে নিজের অন্তরঙ্গ ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হারানো কারো সহ্য হল না। সাংস্কৃতিক আত্মনির্ধারণ সুনিশ্চিত করার জন্যে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অপরিহার্যতা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই পথে ভাবতে গিয়ে কিছু লোক উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল যে, একই সঙ্গে 'জাতিত্বের ভিত্তি ধর্ম' এই ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে না পারলে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। ধর্মের ইসলাম ও রাজনৈতিক অস্ত্রের ইসলাম, এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎ এখন ধরা সম্ভব হল। রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইসলামের বর্জন মানে ধর্ম হিসাবে ইসলামের বর্জন নয়। বদরুদ্দীন উমর যেমন বলেছেন যে, একাধারে বাঙালী ও মুসলমান হওয়ার মধ্যে যে কৃত্রিম বৈপরীত্য আরোপ করা হয়, তা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ। এর স্বরূপ এবারে চেনা গেল—সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াপত্তন। এইভাবে, বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির সংগ্রাম, অর্থনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, এমনকি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে গেল।

ঘটনার মোড় ঘুরল আসলে 1952 সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে তরুণ ছাত্ররা শহীদ হবার পর। সমস্ত জাতিতে শিহরণ জাগল। আন্দোলনের চরিত্রে একটা নাটকীয় পরিবর্তন এল। ভাষা আন্দোলন জনসাধারণের মনের গভীরে নাড়া দিল। কারণ তাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মাতৃভাষা। গ্রামের সঙ্গে শহরের মধ্যবিত্তের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের দরুণও বিস্তৃত গ্রামীন সমর্থন লাভ করা সম্ভব হয়েছিল।

ষাট সালের গোড়ার দিকে হারভারডে, সেন্টার অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ারস-এর সঙ্গে যুক্ত অ্যালেক্স ইনকেলস এক গবেষণা পরিচালনা করেন। 'পাকিস্তান : জাতীয় ঐক্যবন্ধনে ব্যর্থতা' পুস্তকে লেখিকা রওণক জাহান এই গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের ছাত্রদের শতকরা 74 জন এসেছে গ্রাম থেকে, ও এদের মধ্যে আবার শতকরা 55 জন কৃষক পরিবার থেকে। 1952 থেকেই শুরু হল বুদ্ধিজীবী, পেশাদারী ও ছাত্রদের মধ্যে শাসকশ্রেণী সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা ও প্রকাশ্য সম্মুখ সংগ্রাম।

এর ধাক্কা এসে লাগল পূর্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ 1954 সালের নির্বাচনের গায়ে। পাকিস্তানের জন্মের পরে এই প্রথম নির্বাচন। ভোটাধিকার সীমায়িত হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্রথম আবির্ভূত হল, যাকে বলা হয়েছে 'দেশজ অভিজাত শ্রেণী।' পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক অভিজাততন্ত্র, যারা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করেও, বাংলাভাষাকে অস্বীকার করেছিল, দেশের সাধারণ মানুষ তাদের বর্জন করল। একটা প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়াল ছাত্রদল। সাত বছরের স্বাধীনতার পরে, ও সাতটি তরুণ প্রাণ বলিদানের পরে, অবশেষে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার পরিচয় অর্জন করল। কিন্তু এ তো সবে আরম্ভ। বাংলাভাষা বাংলা দেশবাসীর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। শাসকশ্রেণী তাকে নানা বাঁকা পথে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সংকট অব্যাহত থাকল। পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী ইতিপূর্বেই দানা বেঁধে উঠেছিল। শহর অঞ্চলে একটা বাঙালী জাতিগোষ্ঠী চেতনা পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করল।

হাসান হাফিজুর রহমান সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, শুধু জনগণের কথ্য ভাষা হিসাবে বাংলাভাষার পরিচিতির দাবী আদায় করাই যথেষ্ট নয়। এটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, বাঙালী হিসাবে তাদের সম্পূর্ণ পরিচিতি নির্ভর করছে বাংলাভাষার উপরে। এরই জন্য প্রয়োজন একটা বিশিষ্ট বাঙালী পরিচিতি, তাদের আচরণপদ্ধতি, সামাজিক আদানপ্রদান, সম্পর্ক, রীতিনীতি ও মূল্যবোধের দৃঢ় ঘোষণা। রহমানের মতে এই পরিচিতি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পরিচিতি থেকেও পৃথক হতে হবে।

পশ্চিম এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী পরিচিতর পূর্ববর্তী সন্ধানকার্যে পরিবর্তন আনল 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারীর অভিজ্ঞতা। বরং তার পরিবর্তে বাংলাভাষা, বাঙালীর সংস্কৃতি, এমনকি সামাজিক ঐতিহ্যেরও পূর্ণ প্রতিষ্ঠার এক আন্দোলন শুরু হল, তার হিন্দু সংশ্লিষ্টতাকে গুরুত্ব না দিয়ে।

1953 সালের অক্টোবর মাসে শ্রীহট্ট সাংস্কৃতিক অধিবেশনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মহারথী ও বিশেষজ্ঞ ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন :

"পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের রাজনীতিগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ভাষাগত তো শত্রুতা নাই। যে বাংলাভাষা ও সাহিত্য আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা কাহারও কথায় আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।"

হাসান হাফিজুর রহমান জোর দিয়ে বলেছেন যে, 1947 সাল থেকে দুই দেশে সাহিত্যের পৃথকভাবে বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশের লেখকরা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকারী।

বাংলাদেশ তখন এই মেজাজেই ভরপুর। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হল। বুদ্ধিজীবীরা যেন নতুন করে তাঁদের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে আবিষ্কার করলেন। জনসাধারণের ভাষা, বাংলাদেশের কথ্য ভাষা, সামন্ত অভিজাত শ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর ভাষাকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে গেল। সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি ও রূপকল্প ধর্মীয় সংস্পর্শ অগ্রাহ্য করে ভাষায় ফিরে এসে তাকে এক বিশ্বজনীন রূপদান করল। এই নবশোধন প্রক্রিয়া ও পৌরপ্রভাব গ্রামের বন্ধন বজায় রাখল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের নতুন মূল্যায়ন ঘটল। সেই অঞ্চলের চারিত্রিক বিশেষত্ব—বিস্তীর্ণ নদনদী আর নদীর গড়া কোমল মাটিতে লালিত নরনারী এই নতুন প্রকাশভঙ্গীকে রূপদান করল।

সাংস্কৃতিক মূলের এই সৃষ্টিশীল পুনরাবিষ্কার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে ডঃ শহীদুল্লার পৌরোহিত্যে বাংলা বিভাগের আনুকূল্যে পুষ্ট হচ্ছিল। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর সহায়ক। তিনি শেষপর্যন্ত পাকিস্তান থেকে নির্দয়ভাবে বিতাড়িত হন। আর একবার অবিভক্ত বাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সুস্থ সমালোচনার উদার নীতি, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল ফজলের মত বিজ্ঞজনের সযত্ন পরিচালনা ও উৎসাহে পুনর্জীবন লাভ করে।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বিচ্ছিন্নতাবোধ এ নয়। অন্তর্মুখিতার কোন চিহ্ন এখানে নেই। এ ছিল আত্মপ্রত্যয় ঘোষণা, কখনওবা অতিরিক্ত স্বাদেশিকতাদুষ্ট। যে নতুন সাহিত্যের অভ্যুদয় হল, এই সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে, তার মধ্যে একটা

সতেজ শুদ্ধতা ছিল। বাংলাদেশবাসীর জাতীয় আত্মার গভীরে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ ও ইতিহাসের মধ্যে মূলের সন্ধানের সঙ্গে এ সাহিত্য জড়িত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, গবেষণারত পণ্ডিতরা তিরিশ শতক ও মধ্য-চল্লিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রতি এখন বেশী মনোযোগ দিতে লাগলেন। সে যুগটাও ছিল একটা সংগ্রামের যুগ, সাংস্কৃতিক আত্মঘোষণার যুগ, সারা উপমহাদেশের সমগ্র দেশবাসীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অংশ। সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে পূর্ণ মনোনিবেশ সেইসব লেখকদের উপরেই ছিল, যাঁদের পূর্বপুরুষ বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। সেইজন্যেই এত প্রিয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, এবং অবশ্যই কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জীবনানন্দ দাশ ছাড়া এঁদের সকলেই কমবেশী সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনাকে ব্যক্ত করেছেন। আর জীবনানন্দ প্রতিফলিত করেছেন বাংলাদেশের আত্মাকে।

এই জাতীয় পরিচিতির চেতনার উদ্বোধনকে ঈশা খাঁ ও তার মিত্রবর্গের সংগ্রামের দিনগুলোর মধ্যে খোঁজা শুরু হল। মিত্রবর্গের মধ্যে ছিলেন চাঁদ রায়, কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য—যে বারো ভুঁইয়ারা একত্রিত হয়েছিল আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। যে তুর্কী ও আফগান শাসকরা মধ্যযুগে বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন, তাঁরা এখন জাতীয় উত্তরাধিকারের অংশ হিসাবে স্বীকৃত হলেন। আর মোগলরা পাঞ্জাবী ভাষাভাষী পাকিস্তানী শাসকসমাজের পূর্বসূরীদের শামিল বিবেচিত হল। উভয় বাংলার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাধারণ সংগ্রাম বাংলাদেশী জাতি-চেতনার নবজাগ্রত আত্মার অংশীভূত হয়ে গেল। আপন বিশেষত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে জনগণকে একসূত্রে বাঁধার জন্যে যে জাতীয় গাথা ও প্রতীকের একান্ত প্রয়োজন, তা ক্রমশঃ এইভাবে রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল।

যাকে বলা হয় সংস্কৃতির নবজাগরণ, তার প্রতিফলন দেখা গেল সমস্ত শিল্পমাধ্যমের মধ্যে, সাহিত্য, অঙ্কন, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি চলচ্চিত্রেও। জয়নুল আবেদীন তাঁর দুর্দান্ত অঙ্কন ও রেখাচিত্রে এই নতুন সবল সত্তাকে রূপায়িত করলেন। তিনি এক নতুন শিল্পরীতি সৃষ্টি করলেন, যেখানে স্থানীয় লোকাচারের ঐতিহ্য ও উপমহাদেশের উত্তরাধিকারের সঙ্গে মিশে গেল যন্ত্রশিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিমী জগতের অঙ্কনপদ্ধতি। বহু নতুন লেখকের অভ্যুদয় হল, সেইসঙ্গে বহু পত্রপত্রিকা ও সংস্থার আবির্ভাব হল। শিক্ষিতজনের সামনে একটা নতুন চিন্তাজগৎ উন্মোচিত হল, এবং অশিক্ষিত গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছেও তার কিছুটা গিয়ে পৌঁছল। এর উৎকর্ষ প্রকাশ পেল কাব্যে ও ছোটগল্পে। একটা সম্পূর্ণ নতুন বাংলাভাষা ও সাহিত্য

বিকশিত হল, সংবেদনশীল, জোরালো, কখনও মাটির খুব কাছাকাছি, কখনওবা জাতীয় সীমারেখার ঊর্ধ্বে তার পরিব্যাপ্তি। স্বাধীনতাউত্তর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পরীতির গতিপথের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। সে নিজেই এক অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ও মেজাজের রচয়িতা। বাংলাদেশের মানুষ তাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক এক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল, এবং অবশ্যই পাকিস্তানের অন্তর্গত অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে তার কোন মিল রইল না। ডঃ শহীদুল্লা বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাভাষা সেইদিনই নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে যেদিন হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ সমন্বয়ে সে ভাষা হবে ধর্মনিরপেক্ষ ও তথা বিশ্বজনীন। বাংলাদেশের লেখকরা তাঁদের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছেন।

সামাজিক জীবনেও এই সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের প্রতিফলন হল। ইসলামপূর্ব ও ইসলামপরবর্তী উভয় উত্তরাধিকার থেকে আহরিত প্রাচীন লোকাচার, এক ধর্মনিরপেক্ষ, বিশ্বজনীন চরিত্র গ্রহণ করে পূর্ণ উদ্যমে প্রত্যাবর্তন করল। আরবী নামের সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালী নাম যুক্ত হল। শাড়ী ও কপালে টিপ ফিরে এল। চুড়িদারের জায়গা নিল চওড়া পায়ের পাজামা। রোকেয়া বেগম মেয়েদের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দিলেন। তাঁরা ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বাইরের কাজকর্মে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। তাঁরা গান গাইলেন, নাচলেন, কবিতা লিখলেন, গদ্য লিখলেন, ইস্কুল কলেজে শিক্ষকতা করলেন, রোগীর সেবা করলেন, ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব দিলেন, রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিলেন, আবার সংসারও দেখতে লাগলেন। এক নতুন নারীজাতির আবির্ভাব হল। বাংলাদেশের মেয়েদের কাছে, বাঙালী জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার সহ নারী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে এক হয়ে গেল।

বাঙালী সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বড় সহজ কাজ ছিল না। এক প্রাচীন, রক্ষণশীল, সাম্প্রদায়িক ও অন্ধ মুসলিম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবিরত জেহাদ ঘোষণা চালাতে হয়েছিল। বেশীর ভাগ সময় গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিরও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হত। আয়ুব দশকে এই সংগ্রাম আরও তীব্র, আরও কঠিন হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে এর পরিধি ও মাত্রা আরও বিস্তৃত হয়। সৃষ্টিশীল কল্পনা, গান, নৃত্যের বিন্যাস, লোকাচার, অঙ্কন, ভাস্কর্য ও ভাষা, সমস্তই পরিণত হয় সংগ্রামের অস্ত্রে।

ষাটের দশক নাগাদ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলাদেশের এক বৃহৎ শক্তি হয়ে ওঠে। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাকে বরবাদ করার জন্যে আয়ুব উপযুক্ত

পন্থা গ্রহণ করেন। তাঁর পরামর্শদাতাদের এটাও জানা ছিল যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা সাংগঠনিক ও বিপ্লবী ভূমিকা আছে, অতএব তারও নিয়ন্ত্রণ দরকার।

'বেসিক ডেমোক্রেসি'-র মধ্য দিয়ে একটা নতুন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টার সঙ্গে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর নামে প্রচুর অর্থসরবরাহ ক'রে, বুদ্ধিজীবীদেরও কলুষিত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। মাদ্রাসাগুলি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীদের এক কেন্দ্র তৈরী করতে লাগল। বাংলা ভাষাকে উৎসাহ দেবার নামে নবগঠিত অর্থসমৃদ্ধ আকাদমীগুলি মারফৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণ খাটানো হতে লাগল। ঢালাও আর্থিক পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা হল। এইসব আকাদমীগুলি উদারনীতিক লেখকদের লেখা অনেক সময় তাদের অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করত, ও তার বদলে লেখকদের মুক্ত হস্তে পারিশ্রমিক দিত। এই সন্দেহজনক সম্মানভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করার অর্থ ছিল রাজনৈতিক উৎপীড়ন। বুদ্ধিজীবীদের হেয় করার ও তাদের উপরে অন্যায় চাপ সৃষ্টির এ এক প্রচ্ছন্ন চতুর পন্থা।

বহু বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল। যুবসমাজ বিভিন্ন উপায়ে ও কখনও পরোক্ষভাবে পাল্টা লড়াই চালাত। জহীর রায়হানের তোলা চলচ্চিত্রে পারিবারিক নাটকের মধ্য দিয়ে কর্তৃত্বের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হল। অনেকের মধ্যেই এই চেতনা জাগল যে সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতিগোষ্ঠীগত স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রামে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এমনকি সমাজবাদ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এই সংগ্রাম গ্রামীণ অঞ্চলেও পৌঁছে গেল ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল।

বঞ্চিত শ্রেণী ও মেয়েদের সামাজিক মুক্তির সংগ্রামকে এবং জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশাজাত ও উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, পেশাদারী, ছোট ব্যবসায়ী ও বণিকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনাপ্রসূত ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা নতুন তীব্রতার তুঙ্গে তুলে ধরল এই সাংস্কৃতিক ও ভাষা আন্দোলন। এই সমস্ত হেতুগুলো একত্রিত হয়ে গণতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে দাবীর জন্ম দিল, তাকে আর দাবিয়ে রাখা গেল না। এই পরিস্থিতি জনগণের অবারিত অংশগ্রহণের প্রয়োজনকে অবধারিত করে তুলল। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে আন্দোলনের চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠল। □

আট

স্বাধীনতার যুদ্ধে

বারবার আমাদের হাত হয় উদ্দাম নিশান,
বারবার ঝড়ক্ষুব্ধ পদ্মা হই আমরা সবাই।
আমাকেই হত্যা করে ওরা
        বায়ান্নোর রৌদ্রময় পথে,
আমাকেই হত্যা করে ওরা
        উনসত্তরের
                বিদ্রোহী প্রহরে,
একাত্তরে পুনরায় হত্যা করে ওরা আমাকেই,
আমাকেই হত্যা করে ওরা
        পথের কিনারে
        এভেন্যুর মোড়ে
        মিছিলে সভায়—
আমাকেই হত্যা করে ওরা, হত্যা করে বারবার।
তবে কি আমার
বাংলাদেশ শুধু এক সুবিশাল শহীদ মিনার হয়ে যাবে?

—শামসুর রহমান
'বারবার ফিরে আসে' (মার্চ 1971)

যে চব্বিশ বছর ধরে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল, তার ইতিহাস স্থানীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস। জন্মমুহূর্ত থেকে পাকিস্তানে যে দুই পরস্পরবিরোধী বাস্তবের সমাবেশ উদ্ভূত হল, এ তারই পরিণতি। প্রথমতঃ জাতিত্বের একটা কৃত্রিম ও অগ্রহণীয় ধারণার উপরে ভিত্তি করে এক রাষ্ট্রের সৃষ্টি, এবং গঠনমূলক রাজনৈতিক জাতীয় মানসের অভাব। এই দুইয়ে মিলে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক পরিচয়ের সমস্যা সৃষ্টি করল।

দ্বিতীয়তঃ, এই নবজাত রাষ্ট্রের পূর্বাংশ বাংলাদেশ ও পশ্চিমাংশের মাঝখানে প্রায়

দুহাজার কিলোমিটারের ভারতীয় এলাকা। ইতিমধ্যেই সেখানে একটা সুস্পষ্ট জাতির সমস্ত লক্ষণগুলি বিদ্যমান—একটা সাধারণ ভাষা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটা সুনির্দিষ্ট ধারা ও একটি সাধারণ দেশভূমি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্ব যে দায়িত্বের সম্মুখীন হল, তা হল জাতীয় সমন্বয় সাধন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, নবজাত রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের কোন প্রভাব ছিল না। এই নেতৃত্বের গঠন-উপাদানের মধ্যে ছিল উর্দু ভাষাভাষী অভিজাত সম্প্রদায়, উত্তরভারতের সামন্ত জমিদার ও পশ্চিম ভারতের বৃত্তিধারী, বণিক ও শিল্পপতি। এঁরা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানে দেশান্তর গ্রহণ করেছিলেন। সীমিত ভোটাধিকার ও পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে, স্বভাবতঃই এত সহজলভ্য ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকার জন্যে এই নেতৃত্ব উদ্বিগ্ন ছিল। এই ভাবেই, দেশের রাজনৈতিক কর্মাধিকার বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা স্থায়ী আতঙ্ক দানা বেঁধে উঠেছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপরে ততটা নয়, বরং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপরেই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ছিল।

মহম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যু ও লিয়াকত আলি খাঁর হত্যার কিছুদিন পরেই, নতুন ক্ষমতায় আসীন অভিজাত সম্প্রদায়েয় কার্যকলাপে এই প্রবণতা আরও শক্তিশালী হয়। পাঞ্জাবী বেসামরিক ও সামরিক আমলাবৃন্দ দ্বারা গঠিত এই অভিজাত নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষক ছিল দেশান্তরিত ব্যবসায়ীরা। জাতীয় অভিজাত সম্প্রদায় পূর্বাঞ্চলকে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—যতরকমভাবে শোষণ করত, তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক প্রতিবাদ উত্তাল হয়ে উঠত। এইভাবে তারা নিজেরা একটা জাতিতে সংঘবদ্ধ হল।

আসলে সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মের অনেক আগে থেকেই, যখন নতুন রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও বাংলা-ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার যুগ্ম প্রশ্ন তুলেছিলেন মুসলিম লীগের একাংশ ও বামপন্থীরা। পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরতার অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করার যুক্তিসম্মত অনুসৃতি এটা। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই এই প্রবণতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, ও 1948 সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। করাচীতে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার আহ্বান দিল, ও ঢাকায় জিন্না প্রথম পদার্পণ মাত্রই অত্যন্ত উদ্ধতভাবে এর উপরে জোর দেন। ভাষা আন্দোলন স্ফূতির হয় এই দুটি ঘটনার পরেই।

এইভাবে, পাকিস্তানের জন্মের তিন বা চারমাসের ভিতরেই দুই অংশের মধ্যে

ভাষার প্রশ্ন একটা বিবাদ ও তিক্ততার কারণ হয়ে ওঠে। এক পক্ষ অপর পক্ষের উপরে কর্তৃত্ব জাহির করার যন্ত্র হিসাবে এটা পরিগণিত হয়। পাকিস্তানের প্রথম প্রতিবাদসভা হয় 1947 সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। এর পরেই প্রথম ছাত্রধর্মঘট হয় 1948-এর মার্চ মাসে। রেলশ্রমিকরাও এতে যোগ দিয়েছিলেন, এ ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। অবশেষে এল ছাত্রদের উদ্যোগে 1948 সালের এপ্রিল মাসে সফল সাধারণ ধর্মঘট, এবার টের পাওয়া গেল ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে সুবিস্তীর্ণ জনসমর্থন। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতিরও একটা ছকের নিশানা পাওয়া গেল, ছাত্ররা, যারা একটা অস্থায়ী শ্রেণী, সংগ্রামের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের ধর্মঘট সংগঠন ক'রে ছাত্রনেতা হয়ে ওঠেন।

সংগ্রামের এই পর্যায়ে, খুব অল্প লোকের মধ্যে ছাড়া, কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা দৃষ্টিকোণ ছিল না। প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল ভাষা এবং স্বায়ত্তশাসন, ও স্বাধীনতালব্ধ লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান চেতনা। ভাষা আন্দোলন, প্রথম দিকে প্রধানতঃ ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতা অধিকারের ক্রমপ্রকাশমান সংগ্রামে দ্বন্দ্বরত রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি তাকে নানা সুযোগ সুবিধার্থে কাজে লাগিয়েছেন।

দেশবিভাগের সময় বাংলাদেশে মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল ছিল, মুসলিম লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টি। প্রথমটির মধ্যে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে এমন তিনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত। নাজিমুদ্দীন গোষ্ঠী ছিল বনেদী উর্দু ভাষাভাষী সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ ; এরা পাকিস্তানের 'জাতীয়' নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনীতিগতভাবে ঘনিষ্ঠ। সুরাবর্দী গোষ্ঠী, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যথা সরকারী চাকুরে, বৃত্তিধারী ও ছোট ব্যবসায়ীদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছিল। আর ফজলুল হকের গোষ্ঠী প্রধানতঃ গ্রামীণ কৃষিস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত।

শেষোক্ত গোষ্ঠী দুটি বাংলাদেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছিল। তাই স্বায়ত্তশাসন ও ভাষার প্রশ্নে খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধীপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। মওলানা ভাসানী বামপন্থী দলের মধ্যমণি হিসাবে কাজ করতে লাগলেন ; ও একই সময়ে ইসলামী ধর্মপ্রচারকের আচ্ছাদনে নিজেকে শোভিত করলেন।

এই জাতীয় উপাদানের মধ্য থেকেই প্রধানতঃ সুরাবর্দী গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ জন্ম নিল 1949 সালে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে, স্বভাবতঃই তার কর্মকাণ্ডের শুরু হয়েছিল ঈষৎ বামপন্থা ঘেঁষে। এইভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনটি মূল পথের ভিত্তি স্থাপিত হল—চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ। বহু ভাঙ্গাচোরা ও পরিবর্তন সত্ত্বেও, এই স্থূল বিভাজনটা এখনও পর্যন্ত বদলায় নি। কয়েক বছরের মধ্যে, স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এই তিন গোষ্ঠীরই মতামত আরও কঠোর হয়েছে, যদিও কেউই পরিপূর্ণভাবে বন্ধন ছিন্ন করতে চায় নি। ভাষার প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক দল সবসময়ই বাংলাকে কিছুটা ইসলামী করার দিকে সচেষ্ট ছিল।

1952 সালের একুশে ফেব্রুয়ারী শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ-শোভাযাত্রার উপরে পুলিশের গুলিতে কুড়িজন তরুণের মৃত্যু, সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাকে আরও ঘনীভূত করে তুলল। এই স্বাতন্ত্র্য অতি প্রকট হয়ে ওঠে 1954 সাল নাগাদ। এর প্রকাশ ঘটে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, 1935-এর সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার অবলম্বনে, (পাকিস্তান তখনও তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র তৈরী করে উঠতে পারেনি) বাংলাদেশের প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রথম নির্বাচনের ফলাফলে। ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক দলের সহযোগিতায় আওয়ামী মুসলিম লীগ, বাংলাদেশের বুক থেকে মুসলিম লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

দুই পক্ষের এই প্রাথমিক প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে, কেন্দ্রই প্রথম দফায় শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ক্ষমতায় আসীন হবার ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে পদচ্যুত করা হল। যেহেতু 1954 সালের নির্বাচনে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নই প্রধান ছিল, জনপ্রিয় সরকারের পদচ্যুতি, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চরম কেন্দ্রীকরণ ও কোনরকম বিরোধীপক্ষ সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হল।

এটাও পরিষ্কার বোঝা গেল, যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পাঞ্জাবীদের হাতে থাকায়, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ইংরাজ আমলের মতই কেন্দ্রীকরণের সবচেয়ে সফল যন্ত্র। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সেখানে উপহাস্য। মনে হয়, দুইপক্ষের অসাম্য ও পূর্বাংশের উপরে পশ্চিমাংশের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে এক রাষ্ট্র, এক সরকার, এক অর্থনীতি, এক ভাষা ও এক কৃষ্টির নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববোধকে জোরদার করেছিল তুরস্ক, ও আমেরিকার সঙ্গে সামরিক চুক্তি ও 1954 সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে, 'সিয়াটো' ও 'সেণ্টো'র মত সামরিক গোষ্ঠীর সঙ্গে পাকিস্তানের যোগদান। ঘটনার এই বিস্তার পাকিস্তানের ক্রমপ্রকাশ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সামরিক বাহিনীর স্থান সুদৃঢ় করল।

গণতান্ত্রিক শক্তির নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিরন্তর আঘাত হানার এখানেই শুরু। ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জনপ্রিয় নেতাকে ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত করা হতে লাগল : 1948 সালে সুরাবর্দীকে, 1954 সালে ফজলুল হককে, ও 1968 সালে মুজিবকে। আবার এইসব নেতাদের প্রত্যেককেই তারপরে প্রলোভনের জাল বিস্তার করে শাসনক্ষমতার কাঠামোতে ভরে নেবার চেষ্টা হয়েছে। সুরাবর্দী ও ফজলুল হক উভয়েই শেষ পর্যন্ত এই প্রলোভনের শিকার হন, ও স্বল্পায়ু যশ-গৌরব ভোগান্তে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যেতে বাধ্য হন। একমাত্র মুজিবই এ-প্রলোভনকে অস্বীকার করেন।

1954 সালের অভিজ্ঞতার পর সমস্ত মনোযোগ সংসদীয় রাজনীতির উপরে গিয়ে পড়ে, যদিও ক্রমবর্ধমান একনায়কত্বসুলভ আবহাওয়ায় তার চরিত্র বাধানিষেধ জর্জরিত ও সন্দেহাতীতভাবে সীমিত। বাংলাভাষাকে জাতীয় ভাষা করার অধিকারকে ক্রয় করতে হল পশ্চিমাংশের সমস্ত প্রদেশগুলিকে একীভূত করার স্বীকৃতি দিয়ে। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মানুষের পছন্দ হয়নি। এর অর্থ, সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের জন্যে কেন্দ্রীয় সংসদীয় সংগঠনগুলিতে সংখ্যাধিক্যের সুবিধা হারানো, এবং এই সঙ্গে পাঞ্জাবী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশী রাজনৈতিক দলগুলির মৈত্রীবন্ধনের সুযোগ হারানো।

স্বায়ত্তশাসনের অভীপ্সা ম্লান হয়ে গেলেও, অর্থনৈতিক বিকাশের ও রাজস্ব সংস্থানের সমান অংশ ও বেসরকারী ও সামরিক সমস্ত কর্মবিভাগে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সংগ্রাম শক্তিশালী হতে লাগল। এই শেষোক্ত দাবীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হল, কারণ এই হল ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎপত্তিস্থল। সেই সঙ্গে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর প্রতি এটা একটা ভীতিপ্রদর্শন, কারণ তার অস্তিত্বের প্রথম শর্ত হল বাংলাদেশীদের ক্ষমতাবহির্ভূত রাখা, ও পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখা। সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সন্ধানে গিয়ে 1955 সালে আওয়ামী লীগ 'মুসলিম' আখ্যা পরিত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের পরিচয় গ্রহণ করল।

সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শেষ হল 1958 সালে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত আয়ুব খান যে সামরিক একনায়কত্ব স্থাপন করলেন, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল 'দেশী' ভাষাভাষী অভিজাত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতাসীন হওয়ার পথরোধ করা। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে সাধারণ নির্বাচনের ধার্য সময়ের মাত্র পাঁচমাস আগে শাসনব্যবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে চার বছরের জন্যে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

আয়ুবের সামরিক অভ্যুত্থান পাকিস্তানের আসল ক্ষমতার উৎসকে উদ্‌ঘাটিত করল। সীমিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পূর্ব-পশ্চিমের বিরূপ সম্পর্ককে এ পর্যন্ত যেটুকু সংযত রাখতে সফল হয়েছিল, নিরাপত্তার সেই পথটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। আয়ুবের বেসিক ডেমোক্রেসির শাসনতন্ত্র প্রাচীন সামন্তবাদের ভিত্তিকেই পরিপুষ্ট করল ও যে শাসনপদ্ধতি এর মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাকে আইনানুগ রূপ দিল। জনসমর্থিত রাজনীতিবিদ্‌দের রাজনৈতিক অধিকারকে বাতিল করে দেওয়া হল। শৈল্পিক ও বাণিজ্যিক বুর্জোয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায়-সামরিক বাহিনী সামরিক ও বেসামরিক জোটের উপরে আধিপত্য সুনিশ্চিত করল। 1962 সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচন, এই শাসনপদ্ধতি ও আয়ুবের ব্যক্তিগত রাজকে বৈধতা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

এই নির্বাচনগুলি অবশ্য একটা শহরকেন্দ্রিক, উদার গণতান্ত্রিক উন্মাদনা জাগাল উভয় অংশেই, বিশেষ করে বাংলাদেশে, এবং এদের মধ্য থেকেই জাতীয় পরিষদে বিরোধীপক্ষ জন্ম নিল; পরবর্তী কয়েক বৎসরে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের চেষ্টায় বার বার বিফল হয়ে বাংলাদেশের মানুষ প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মনোভাবে পৌঁছল। 'বেসিক ডেমোক্রেসি' চাইল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে টুকরো টুকরো ভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বেঁধে রাখতে। সেই সঙ্গে স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যকলাপের অভাবে প্রাদেশিকতাই পুষ্ট হতে লাগল, গণ-সংগঠন ও গণ-সমর্থিত রাজনৈতিক দল গড়বার পথে বাধা সৃষ্টি হল। এতে শুধু দেশের দুই অংশের মধ্যে ফাটল আরও বৃহদাকার ধারণ করল।

সীমিত হলেও, অর্থনৈতিক বিকাশের বর্ধিত গতি, শহুরে অভিজাত, বিশেষ করে সরকারী ও সামরিক আমলাদের সংখ্যা বর্ধিত করল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চতর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশীরা কোন স্থান পায়নি, কারণ তাদের স্তর নিম্ন। এর পরিণামে যে হতাশাবোধ, তা আরও তীব্র আকার গ্রহণ করল শ্রেণীবৈষম্য হেতু। পশ্চিমের বেসামরিক ও সামরিক আমলারা এসেছিল সামন্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। এবং পূর্বাঞ্চলে তারা ছিল তুলনামূলকভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী, দ্বিতীয় প্রজন্মের শহরবাসী, আর তাদের ছিল ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা।

পূর্বাঞ্চলের নগরকেন্দ্রিক 'বেসিক ডেমোক্র্যাট'রা এসেছিল বণিক ও দালাল শ্রেণী থেকে। এরাই ছিল শাসকশ্রেণীর সামাজিক ভিত্তি, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতায় এদের কোন অধিকার ছিল না। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন তাই নাগরিক বুদ্ধি-জীবীদের সমস্ত অংশের অকুণ্ঠ সমর্থন পেল। ধর্মঘটের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, বৃদ্ধিহীন

মজুরি ও মুদ্রাস্ফীতি শ্রমিক শ্রেণীকে বিমুখ করেছিল। গ্রামাঞ্চলে বৃহত্তর ভূস্বামীদের হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত সমাবেশ অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দিল ও সাধারণ কৃষক শ্রেণীকে দূরে ঠেলে দিল। শাসনব্যবস্থার সমর্থন লাভের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদনপ্রাপ্ত দুর্নীতি সমাজের মধ্যে ঘুণ ঢুকিয়ে দিয়েছিল ও সাধারণ মানুষের অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়েছিল। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে ছিল হিংসার বীজ, কারণ একেবারে প্রথম থেকেই মতানৈক্যের জবাব দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যপুষ্ট উন্মত্ত হিংসা দিয়ে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দিয়ে। সরকার তাতে উৎসাহ জুগিয়েছেন, এমনকি দাঙ্গা হয়েছে সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে।

পশ্চিম সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রায় সম্পূর্ণ মোহচ্যুতি আরও পরিষ্কার হল, যখন দেখা গেল যে 1965 সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় পূর্বাঞ্চলে আয়ুব শতকরা মাত্র 53টি আসন পেয়েছেন, যেখানে পশ্চিমাঞ্চলে তার সংখ্যা শতকরা 73টি। 1964 সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ও সংগঠিত প্রতিরোধ বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। এর পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অরক্ষিত ঐ অঞ্চলের অসহায়ত্ব, এবং পশ্চিমাংশের রণাঙ্গণে বাংলাদেশী সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যদের বীরত্ব, আত্মরক্ষার জন্য পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার মানসিকতা থেকে জনগণকে মুক্তি দিল। এর সঙ্গে জড়িত ছিল যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির অসম বণ্টনের বোঝা। কাশ্মীরের প্রশ্ন এত সুদূর যে তার গুরুত্ব বাংলাদেশকে স্পর্শ করা কঠিন ছিল।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের পুঞ্জীভূত প্রকাশ প্রতিফলিত হল পরবর্তী পর্যায়ের দ্রুত, চরম বৈপরীত্যবোধের মধ্যে। এরই রূপায়ন দেখা গেল শেখ মুজিব ঘোষিত ছয় দফা কর্মসূচীতে। সুরাবর্দীর মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বস্থান অধিকার করেন শেখ মুজিব। তাঁর এই কর্মসূচী ছিল কার্যতঃ চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রজোটের দাবী। ভাষাগত জাতীয়তাবাদ, স্বায়ত্তশাসন, ভারসাম্যযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এখন একীভূত হয়ে গেল। এই মত ও পথের দরুণ আওয়ামী লীগ একটি প্রাদেশিক দলে পরিণত হল, এবং সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মৈত্রীর সম্ভাবনার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল।

ছয় দফা কর্মসূচী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় নিয়ে এল। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকরা পাকিস্তানের

ইসলামী রাষ্ট্রের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠায়, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আরো দুস্তর হল। চীন-সোভিয়েত বিরোধিতার চাপে মার্কসবাদী বামপন্থীরাও তখন খণ্ডিত। এবং চীনপন্থীরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের সংহতি নাশের বিরোধী।

1967-68 সালে মুজিব, কিছু বাংলাদেশী বেসামরিক ও সামরিক আমলা ও একজন ভারতীয় কূটনীতিককে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হলে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। আয়ুব রাজত্বের বিরুদ্ধে পশ্চিমে বিক্ষোভ ফেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা পূর্বাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রথম জনগণের বিরোধিতার দুই ধারার মিলন হয় এবং পূর্বাঞ্চলের স্বাধিকারের সংগ্রাম, এযাবৎ প্রভুত্বকারী অভিজাত জোটের মুঠি থেকে সারা পাকিস্তানের মুক্তির জন্যে জাতীয় সংগ্রামের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। একটা গ্রহণযোগ্য সর্ব-পাকিস্তানী নেতৃত্বের অভাবের দরুণ, শাসকশ্রেণী এই দুই সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়। সেই সময়ে বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন সেখানকার মানুষের সংগ্রামী মনোভাবের পরিচায়ক।

পদত্যাগ করার আগে আয়ুব প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হন। আত্মরক্ষামূলক সামরিক আইনের পুনঃপ্রবর্তন করার পরে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানকে পুনরায় বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক প্রদেশে ভাগ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীদের শান্ত করতে সক্ষম হন। এর ফলে পূর্বাঞ্চলের ছয় দফা কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রাম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনরূপে প্রতিভাত হল।

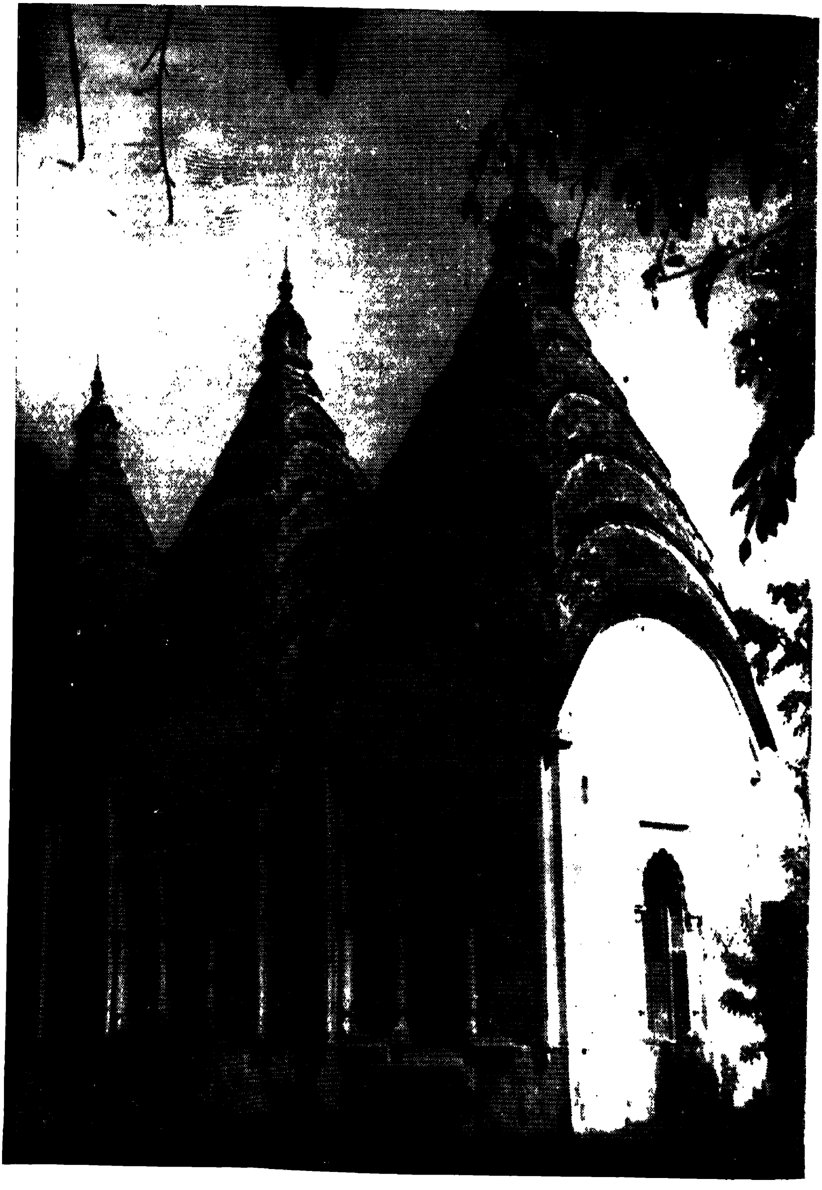
সংগ্রামের তৃতীয় ধাপ—1970 সালের নির্বাচন অভিযান। 1969-এ নভেম্বর মাসে সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডব ও ঝঞ্ঝাপীড়িত মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের প্রতিও কেন্দ্রের অবহেলা অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিল। পরবর্তী মাসে নির্বাচনের জুয়াখেলা এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে ঘটলেও, পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর বিশেষ লাভ হল না। উভয় অঞ্চলেই শাসকশ্রেণীর অবস্থা বেশ কাহিল দেখা গেল। সবচেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থা হল যে, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ শুধু যে প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনে তুমুল জয়লাভ করল তা নয়, পূর্বাংশের বৃহত্তর লোকসংখ্যার দরুণ জাতীয় পরিষদেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হল।

এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুত শাসনতন্ত্র গঠন পরিষৎ অবশ্যম্ভাবীভাবে মুজিবের ছয়দফা কর্মসূচীকে আইনসম্মত করে দিত। এর অর্থ শুধু পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর অবলুপ্তি নয়, পশ্চিম কর্তৃক পূর্বের শোষণেরও অবসান। তা হয়তো

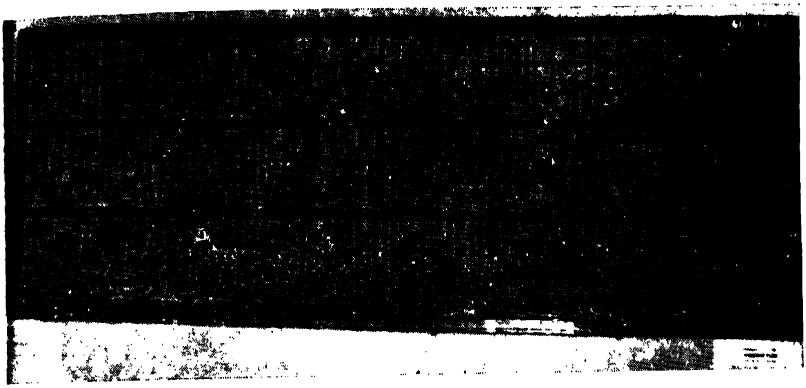


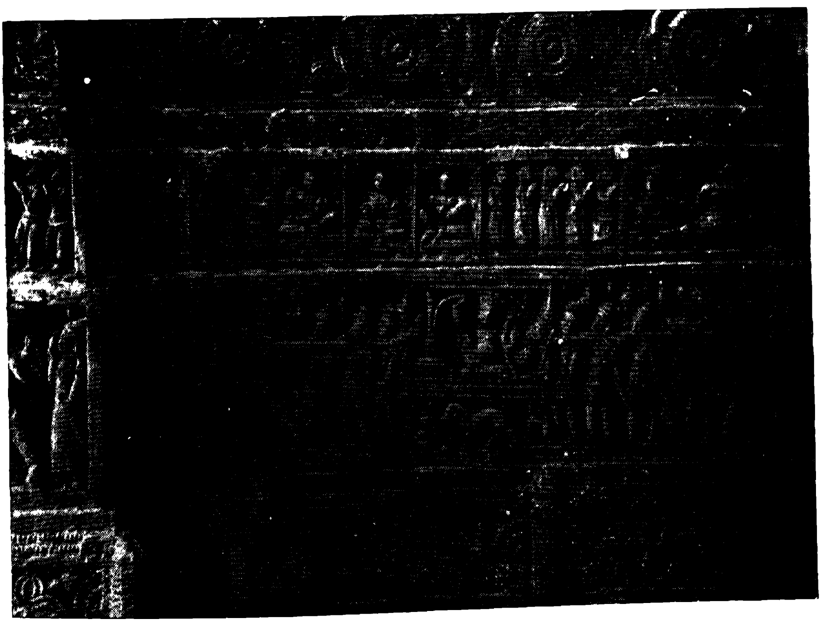
সাত মসজিদ (সাত গম্বজযুক্ত) ঢাকা

ঢাকেশ্বরী মন্দির, ঢাকা

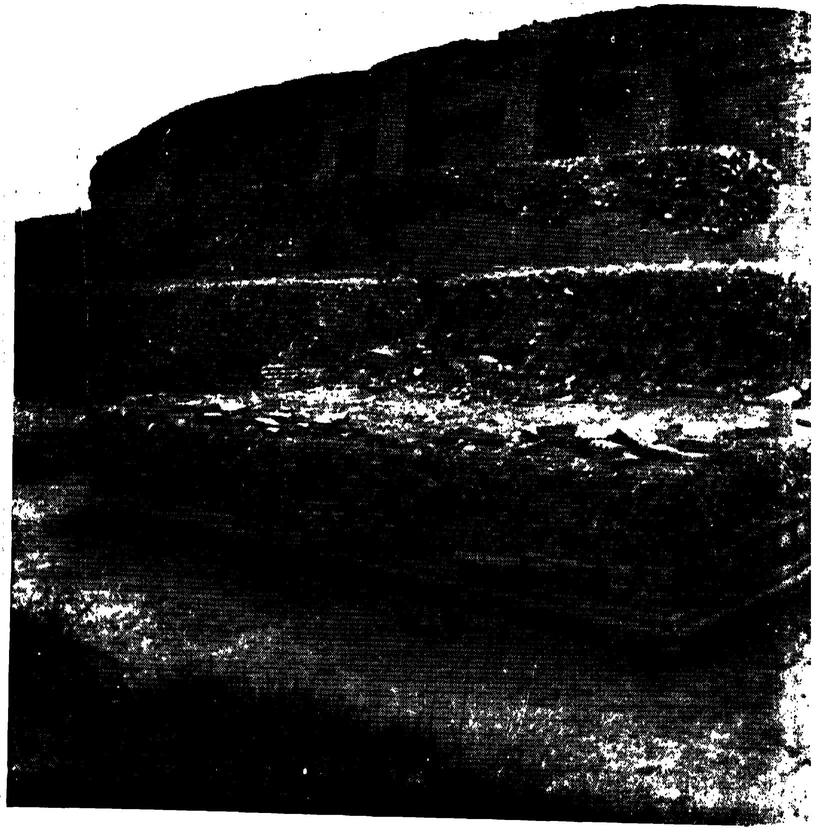


পাথরের পাতের উপর আরবি হস্তলিপি শিল্প

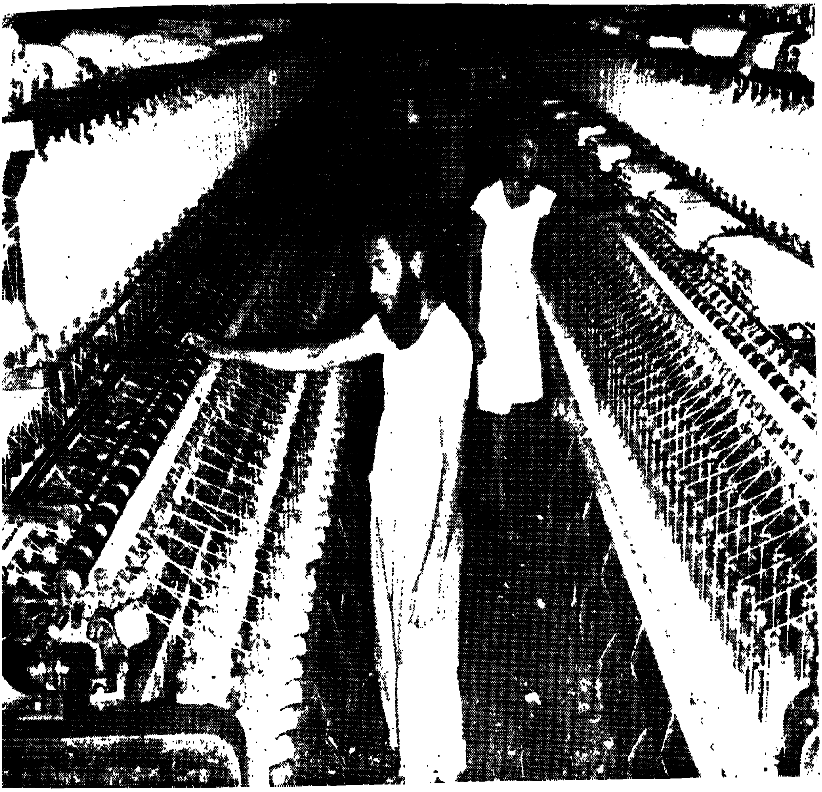




দিনাজপুরের কাছে কান্তনগর মন্দিরের দেয়ালে
পোড়ামাটির কারুকার্য



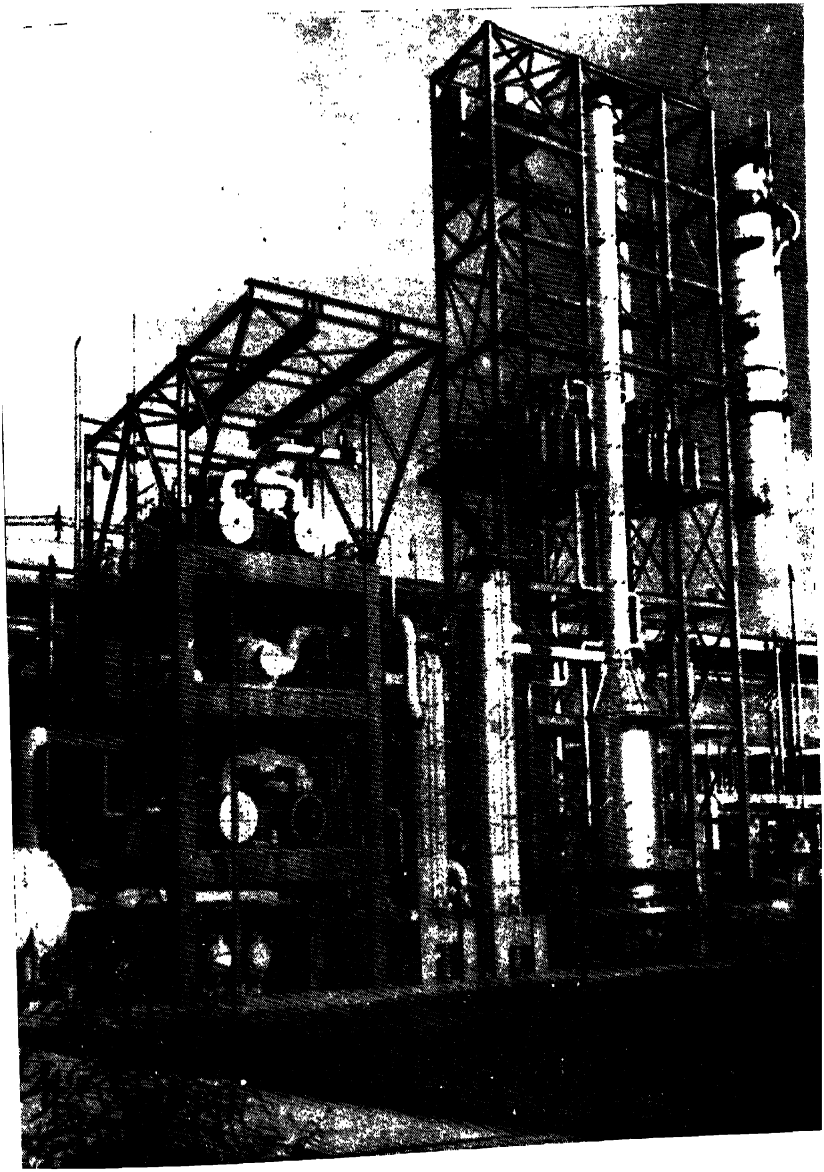
কুমিল্লায় ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ



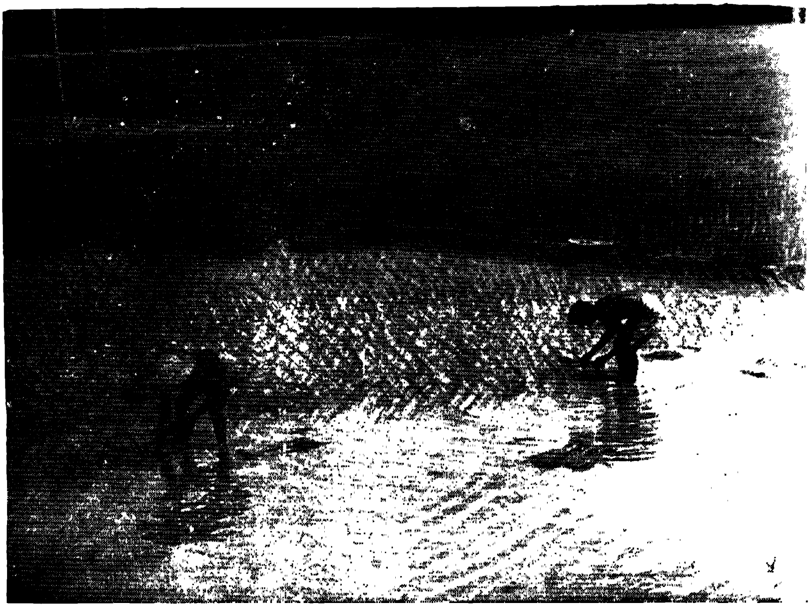
নারায়ণগঞ্জে একটি আধুনিক সুতাকল

খুলনায় নিউজপ্রিণ্টের কারখানা

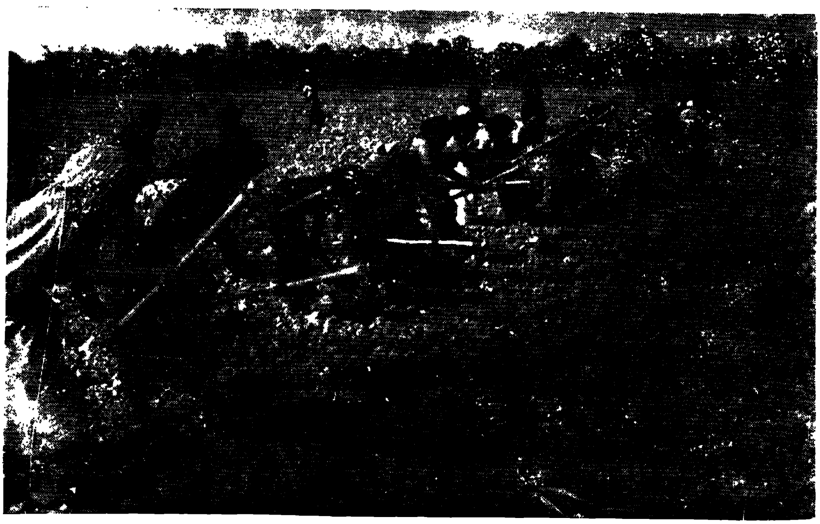




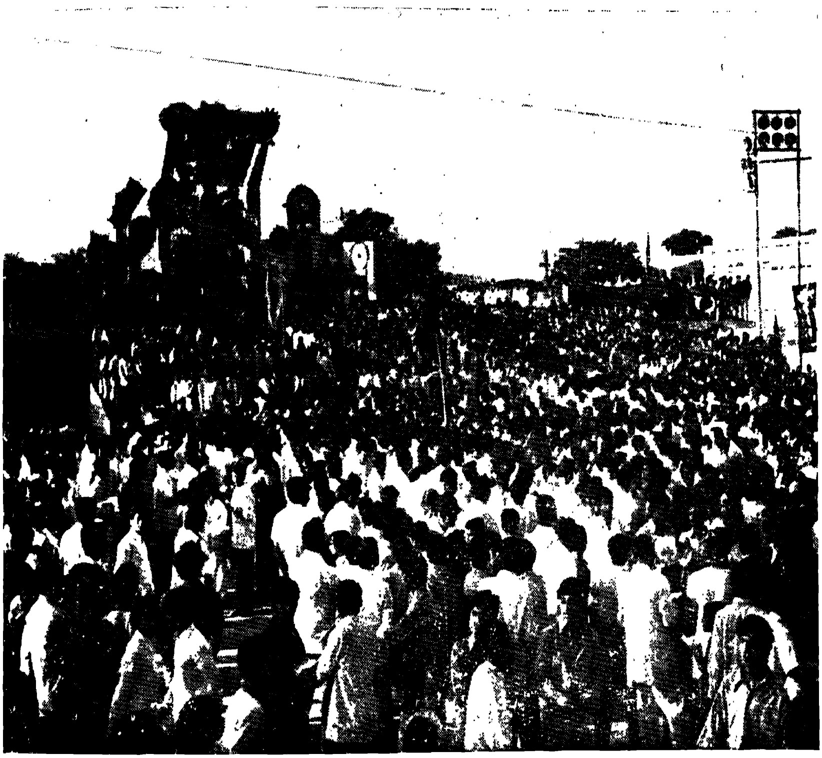
ঢাকায় সার তৈরীর কারখানা



ধান পুনর্বপন



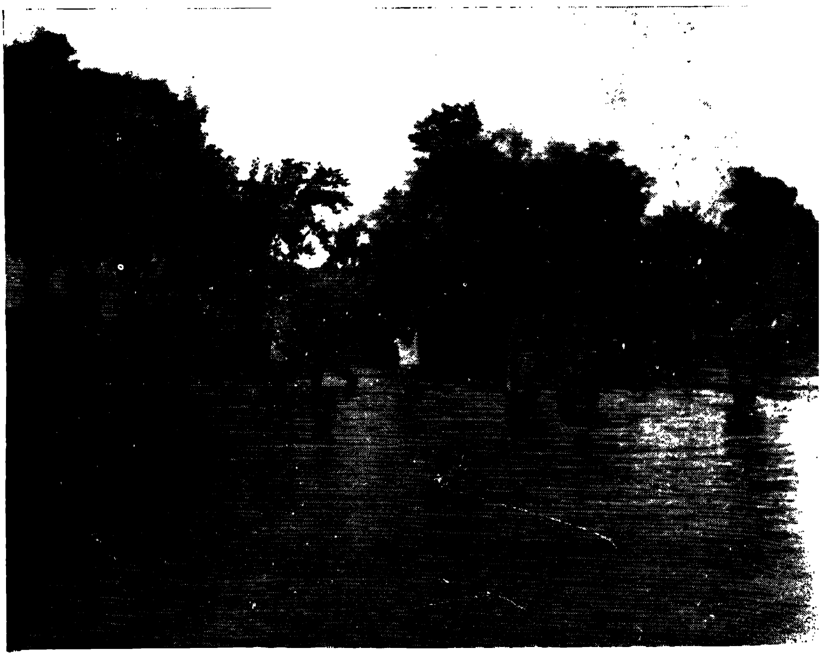
বীজ বপনের আগে জমির প্রস্তুতি



জাতীয় শহীদ মিনার, ঢাকা



শেখ মুজিবর রহমান



মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর একাংশ



1971 সালের 17 এপ্রিল, মুজিবনগরে
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম
সম্মানসূচক কুচকাওয়াজ পর্যবেক্ষণ করছেন

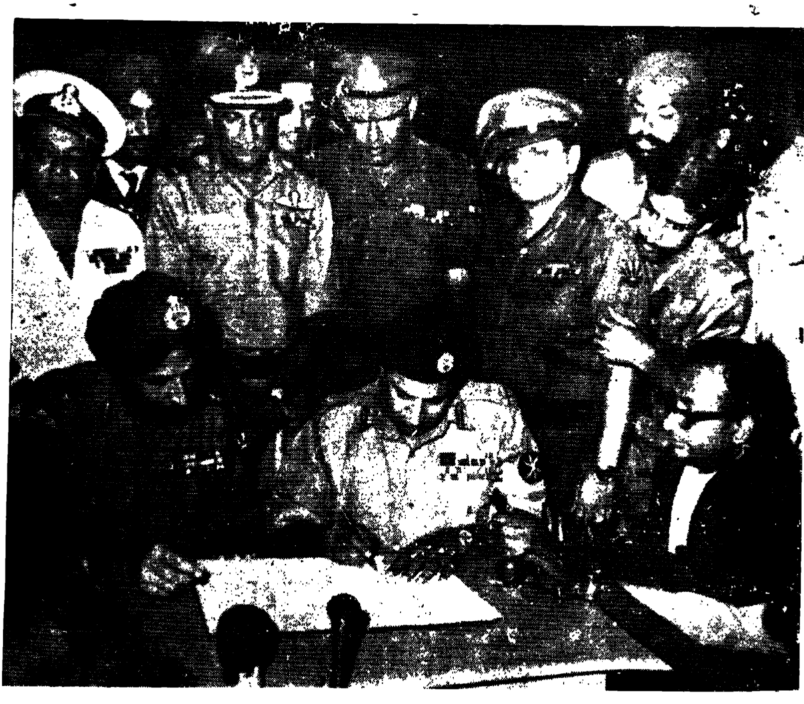


মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনী



↑ 1971 সালের 16 ডিসেম্বর, ভারত ও বাংলাদেশের যুক্ত সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে ঢাকায় উপস্থিত হলে, জনসাধারণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান

লেঃ জেঃ নিয়াজী পাকিস্তানী আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করছেন। পাশে উপবিষ্ট লেঃ জেঃ অরোরা। ↓

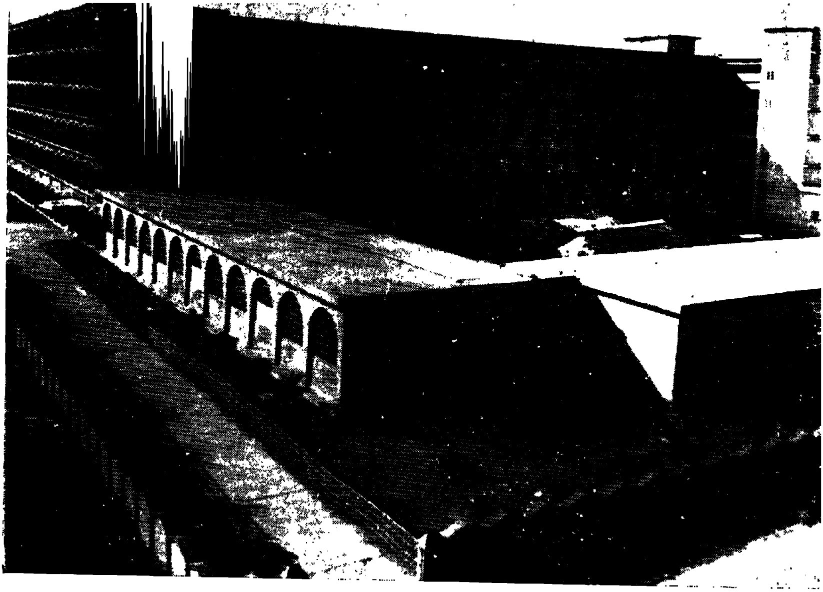




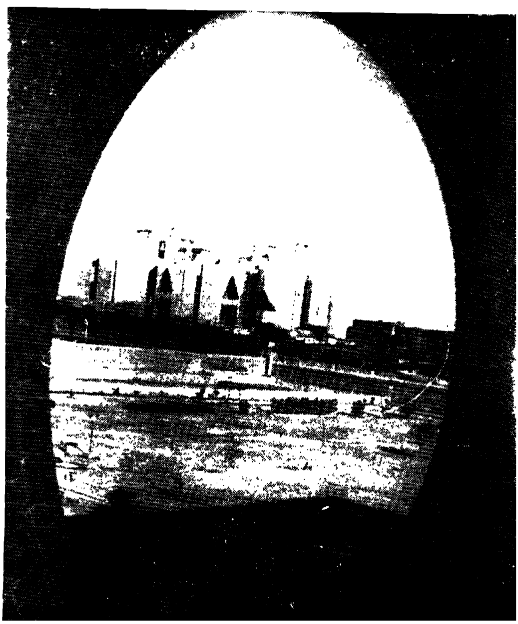
আধুনিক নৃত্যনাট্য 'নক্সী কাঁথার মাঠ'-এর
একটি দৃশ্য



বাংলাদেশে দুর্গাপূজা



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা



ঢাকায় নির্মীয়মাণ সংসদ ভবন



ঢাকার একটি বাণিজ্যিক এলাকা



ঢাকার রাজপথ

রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখত, কিন্তু শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিতে এই ঘটনা-পরম্পরা এমন একটা সমাজবিপ্লবদ্যোতক, যা পুরো দেশের চেহারা বদলে দেবে। নিজেদের বাঁচাবার তখন একমাত্র উপায় বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দেওয়া। অতএব, শাসনতন্ত্র গঠনপরিষদের সভার আহ্বান স্থগিত রাখা হল, ও পশ্চিমে বিরোধীপক্ষের নেতা, জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে সমঝোতা করা হল।

এরপরে যা ঘটল তা ছিল অবধারিত। গণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে মুজিব আশা করেছিলেন কোনরকম একটা আপোষ মীমাংসার। কিন্তু গণ আন্দোলনের গতির একটা নিজস্ব ধারা অবশ্যম্ভাবী। সেটা প্রায় একটা বিপ্লবের রূপ নিল। সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস হলেও তার ব্যাপ্তি ছিল 1942 সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের চেয়েও অনেক বেশী। সেই আন্দোলনের স্রোতের টানে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষ ভেসে এল, এমনকি সামরিক বিভাগের, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের কর্মীরাও। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ বিপ্লব ধাপে ধাপে সযত্ন-পরিকল্পিত ছিল না। সমাজের বিভিন্ন অংশ নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যেই এতে যোগ দিয়েছিল।

মুজিব আশা করেছিলেন, ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলাকালীন গণ-অভ্যুত্থানের জয়রথ তাঁকে জয়মাল্য এনে দেবে। ওদিকে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী আলাপ আলোচনার সুযোগ নিল সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্যে, যাতে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে একটা দ্রুত ও অদম্য আক্রমণে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়।

1971-এর 25 মার্চের রাতে অতর্কিত সামরিক আক্রমণের সঙ্গে শুরু হল বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নতি ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদের দাবীর সংগ্রামের শেষ পর্যায়। এই শেষ পর্যায়কেও তিনটে সুনির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে ভাগ করা যায়।

পাকিস্তানের রক্তের নেশা সাধারণ মানুষকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে টেনে নামাল। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর উপরে যখন পাকিস্তানী সৈন্যরা সদলবলে আক্রমণ চালাল, তখন প্রশ্নটা দাঁড়াল : হয় প্রতিরোধ, নয় মৃত্যু। আওয়ামী লীগ গণ-সংগঠন তৈরী করার সময় পায়নি, কারণ আয়ুবশাহীর আমলে খোলাখুলি রাজনৈতিক কার্যকলাপের হুকুম ছিল না। মুজিবের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মানুষকে আকর্ষণ করে তাকে অনুপ্রাণিত করার উপাদান ছিল। তাঁর নেতৃত্বের চারিপাশে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, মুজিবের আত্মসমর্পণ এবং প্রচণ্ড সামরিক আক্রমণে তার বিলোপ ঘটে। মুজিব সম্ভবতঃ মার্কিনীদের পরামর্শে

আত্মসমর্পণ করেছিলেন, চেয়েছিলেন হত্যার তাণ্ডব রোধ করতে, আশা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত একটা রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছনো যাবে। পাকিস্তানী শাসকদের পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম।

ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের মুখোমুখি হতে হবে, এ কথা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ভাবেনি। তাই অসংগঠিত জনগণকে রাশে আনতে ও প্রধান শহরগুলোর উপরে অধিকার স্থাপন করতে তাদের দুই মাস সময় লেগে গেল। বেসামরিক নাগরিকদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ফলে ভারতে বাস্তুত্যাগীদের অভূতপূর্ব অনুপ্রবেশ ঘটল। যা ন্যায্যতঃ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঘটনা হওয়া উচিত, তা এইভাবে ভারতের পক্ষে এক বৃহৎ সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

বর্বর সামরিক আক্রমণ ও সেইসঙ্গে দৈহিক নিপীড়ন, স্ত্রীলোকের উপরে বলাৎকার ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিল। চট্টগ্রাম রেডিও থেকে 26 এপ্রিল, বিদ্রোহীদের এক দল স্বাধীনতা ঘোষণা করে, পরদিন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি) আনুষ্ঠানিকভাবে তার সত্যতা স্বীকার করেন। 10 এপ্রিল নির্বাসিত অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়, যা এর পরবর্তীকালে 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। (বাংলাদেশের ভারতসীমান্তে এই নামের গ্রামে এই সরকারের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান সংগঠিত করা হয়েছিল)। স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাংলাদেশের জনগণ 1970 সালের সাধারণ নির্বাচনে যে মহতী রায় ঘোষণা করেছিল, পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ যা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, তারই বাস্তবতা এইবার গঠনতান্ত্রিক সমর্থন পেল। এইভাবে স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম রূপান্তরিত হল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে, সংখ্যাভারে গরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষের শুধু বাঁচার সংগ্রামের যুদ্ধে।

মে থেকে সেপ্টেম্বর, মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়, উভয় পক্ষেরই সংহতি ও পুনঃ সংগঠনের কাল। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সমর্থনে জোট বাঁধল। চরমপন্থী মার্কসিস্ট বাম দল বিভক্ত। তাদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী ছোট ছোট এলাকায় বিযুক্তভাবে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করল, অন্যেরা সরে রইল এই অজুহাতে যে এ-যুদ্ধ ভারতীয় বুর্জোয়াদের সম্প্রসারণবাদের উদ্দেশ্যমূলক এবং বাংলাদেশী বুর্জোয়াদের ক্ষমতাসীন করার সহায়ক, যার পিছনে রয়েছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ।

মুক্তিসংগ্রামের পরিচালিকাশক্তি নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায়, নেতৃত্বের দুটি প্রধান কেন্দ্র—নির্বাসিত মুজিবনগর সরকার এবং মুক্তিবাহিনী। মুজিবনগর

সরকারের মধ্যে ছিল শুধু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও বেসামরিক কর্মচারীবৃন্দ। মুক্তিবাহিনীতে ছিল ছাত্র ও কৃষক গেরিলা। কাদের সিদ্দিকী ও তার অনুগামীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক স্বতন্ত্র দল হিসাবে কাজ করছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল—কম্যুনিস্ট পার্টি, মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি [ন্যাপ (এম)] ও মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—বাইরে থেকে মুজিবনগর সরকারকে সমর্থন করতেন। কম্যুনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (এম)-এর নিজস্ব গেরিলাদল ছিল।

ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের একটা আশ্রয়স্থল ও সুরক্ষিত পশ্চাদ্‌ভাগের নিশ্চয়তা দিল, তাদের প্রশিক্ষণের সুবিধা দিল, ও কিছু অস্ত্র সরবরাহ করল। এছাড়াও ভারত, বাংলাদেশের ব্যাপক গণহত্যা ও তার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এক বিরাট প্রচারকার্য চালাল কূটনৈতিক মহলে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায় শুরু হল বর্ষাকালের অব্যবহিত পরে। বাংলাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে তখন পুরোদস্তুর সৈন্যদলের সঙ্গে প্রবেশ করল সুশিক্ষিত ও অস্ত্রে সুসজ্জিত গেরিলাদল। অবশেষে তেসরা ডিসেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে পাকিস্তান নিজেই নিজের কবর খুঁড়ল। এইভাবে ভারত ও বাংলাদেশ একই সংগ্রামের শরিক হল। স্বাধীনতাযুদ্ধে সাফল্য, এবং 1971 সালের 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশে যুক্ত সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সৈন্যের আত্মসমর্পণের সঙ্গে এই সংগ্রামের সমাপ্তি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ মুষ্টিমেয় মানুষের চেতনায় আবদ্ধ অবস্থা থেকে গণবাস্তবতায় উত্তীর্ণ হল। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের একটা শিথিল যুক্তমিত্ররাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতার সংগঠনে বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ। সেই সংগ্রামের পরিণতি হল এক ঐকিক রাষ্ট্রজাতির সৃষ্টিতে। পরিকল্পনায় এমন ছিল না। এ হল পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক বিধি প্রতিষ্ঠার ও জাতীয় একত্রীকরণ অর্জনের ব্যর্থতার চরম পরিণতি। এইভাবে, নানা ঘটনার অভূতপূর্ব যোগাযোগ পৃথিবীর মানচিত্রে এক নতুন রাষ্ট্রজাতির স্থান খচিত করল—বাংলাদেশ। □

নয়

স্বপ্ন ও বাস্তব

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার সোনার বাংলা' (বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত)

বাইরে থেকে দেখতে গেলে, বাংলাদেশের বিপ্লব একেবারে কেতাবী সূত্রের পথ অনুসরণ করে গেছে। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীর সাধারণ ধর্মঘটের পরেই কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে শামিল হয়েছে বেসামরিক ও সামরিক আমলারা এবং সামরিক বাহিনী। কিন্তু এ ঘটনা পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটে নি, এ হল নানা ঘটনাপ্রবাহের চরম পরিণতি। চূড়ান্ত সংগ্রাম, ও অবশেষে পাকিস্তান থেকে অপসৃতি, বাংলাদেশের লোকের উপরে স্রেফ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

স্বাধীন অস্তিত্বের দায়িত্বের জন্যে কোনরকম মানসিক, সাংগঠনিক বা আদর্শগত প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক বিপ্লবেরই একটা নিজস্ব যুক্তিগ্রাহ্যতা থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যতই ক্ষণজীবী ও পরিকল্পনাবিহীন হোক, সাধারণ মানুষকে কিছুটা রাজনীতি-সচেতন করেছিল। জেগে উঠেছিল অসম্ভবের প্রত্যাশা।

নেতিবাচক জাতীয়তাবাদ ঘিরে যেসব বিরোধী স্বার্থ একত্রিত হয়েছিল, তারা এখন বিজয়মাল্যের একচেটিয়া অধিকার চাইল।

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু যে-যুদ্ধের তিনি বীর নায়ক, তার শেষ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। ফলে এই সংগ্রাম ও তার প্রত্যক্ষ নেতাদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব হল মিশ্রিত। কিন্তু তাঁর বৃষস্কন্ধে ভার পড়ল নবজাত রাষ্ট্রকে সুস্থ করে দাঁড় করানোর সুকঠোর দায়িত্ব। পাকিস্তানী শাসনের উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া দুরপনেয় সমস্যাগুলি, শত্রুর ব্যাপক ও নির্মম ধ্বংসলীলায় আরও জটিল হয়ে উঠল। মনে হয়, পাকিস্তানীরা ঠিক করেছিল যে পূর্বাঞ্চলকে যদি ছেড়েই দিতে হয়, তবে তাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলে রেখে যাবে।

স্বাধীনতা লাভের পর দেখা গেল, বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় দরিদ্রতম দেশ। মাথাপিছু বার্ষিক আয় 316 টাকা। এই দেশের দরিদ্রতম শতকরা 20 ভাগ লোকের দৈনিক আয় 20 পয়সার বেশী নয়। লোকসংখ্যা 7.3 কোটি, পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ জনসংখ্যাধিক দেশ। 165, 375 বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব, নদীর অংশ বাদ দিলে, দাঁড়ায় 1.25 বর্গ কিলোমিটারে—3,000, যেখানে কৃষি-উন্নয়নের হার কদাচিৎ বছরে শতকরা 2.1, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা তিন।

লোকসংখ্যার শতকরা 80 ভাগ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। চাষযোগ্য জমি যেখানে 8.4 কোটি হেক্টার, জনপ্রতি ভাগে পড়ে 0.12 হেক্টার। বাস্তব অবস্থা অবশ্য আরও করুণ। 86 লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে, 32 লক্ষ ভূমিহীন, 40 লক্ষের উপরে কৃষকের জনপ্রতি এক হেক্টারেরও কম জমি। শুধু 30.000 কৃষক পরিবারের 10 হেক্টার বা তার বেশী খামার আছে। এই সব খামারের তত্ত্বাবধানে ভাগচাষীর এক বিশাল বাহিনী আছে, যাদের ছোট ছোট অংশে জমি বণ্টন করা হয়।

জমির উপরে প্রচণ্ড চাপ, উৎপাদনের আদিম পদ্ধতি, ও অসম ভূমিসম্পর্কের ফলে, পলিমাটিসমৃদ্ধ জমি সত্ত্বেও উৎপাদনের হার কম। কর্ষণের জন্য আরও বেশী ভূমি সংযোগ করার সুযোগ অনুপস্থিত। তার উপরে নিয়মিত বন্যা ও ঘূর্ণীবাত্যার ধ্বংসলীলা। যদিও প্রধান শস্যের সার্বিক এলাকার 70 ভাগ জমি ধান চাষে নিয়োজিত, চালের শতকরা 75 ভাগ কৃষি অঞ্চলেই খরচ হয়ে যায়। অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে হয় চাল আমদানী ক'রে। কৃষির উপরে অত্যধিক চাপের অর্থ, অন্য উৎপাদনের সংস্থানের দীনতা। চিহ্নিত খনিজ পদার্থের পরিমাণও সীমাবদ্ধ, একমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রচুর। কিন্তু এই পরিমিত

খনিজ পদার্থগুলিও দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপূর্বের শেষ প্রান্তবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। অতি গভীর খননের প্রয়োজনের দরুণ কয়লা কাজে লাগানো সহজসাধ্য নয়। অল্পস্বল্প উদ্ভিজ্জ অঙ্গার, পাথুরে চুণ, চীনামাটি, মোনাজাইট, ইলমেনাইট ও জিরকন আছে। ইস্পাতশিল্পের ভিত্তি, বর্জিত লৌহখণ্ড ও আমদানীকরা লৌহপিণ্ড গলানোর উপরে। প্রায়োগিক সমস্যার জন্য চট্টগ্রামে কাঁচা লোহার সামান্য পুঁজিও অব্যবহার্য। সিমেন্ট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ পাথুরে চুণের অভাব। এবং শক্ত ইঁটের ঝামাও আমদানীনির্ভর।

জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র দশ ভাগ পাওয়া যায় যন্ত্রশিল্পগুলি থেকে। এতে বৃহৎ শিল্পের অংশ শতকরা মাত্র ছয় ভাগ। সমগ্র শ্রমশক্তির শতকরা মাত্র চার ভাগ এখানে কাজ পায়। তিন প্রধান শিল্পের মধ্যে, শতকরা 86 ভাগ শ্রমিক নিযুক্ত হয় বটে, কিন্তু পাট ও চা মুখ্যতঃ রপ্তানীনির্ভর হওয়ায়, পৃথিবীর বাজারের উত্থানপতনে এই দুই শিল্পই প্রতিকূল প্রভাবের শিকার হয়। সুতিবস্ত্র শিল্পের অস্তিত্বই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বিদেশাগত কাঁচামালের উপরে।

স্থানীয় ব্যবসায়-উদ্যম অতি পরিমিত। প্রধানতঃ ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে, এবং আমদানীকৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির উপরে নির্ভরশীল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রধানতঃ আমদানীনির্ভর অর্থনীতি হওয়ায়, পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ অন্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের, এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয় দৈনন্দিন পণ্য, যথা চিনি, খাবার তেল, কেরোসিন, কয়লা, বস্ত্র, চিকিৎসার যাবতীয় ওষুধ ও খাদ্যশস্যের একান্ত অভাব। চা এবং পাট রপ্তানীজাত আয় এইসব অতিপ্রয়োজনীয় আমদানীর খরচের পক্ষে নিতান্ত সামান্য। তার উপরে নবজাত সরকারকে কাজ শুরু করতে হল বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য ভাণ্ডার নিয়ে।

নির্বিচার শোষণের উত্তরাধিকার আরও জটিল হয়ে উঠল নানা অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ে। এক কোটি মানুষ, যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসরণ করে দেশে ফিরে এল। সরকারী গুদামে স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার মতনও রসদ ছিল না। প্রায় দুই কোটি মানুষ গৃহহারা ও হৃতসর্বস্ব, তা সে যত সামান্য সম্পদই হোক। প্রায় ছয় মাস যাবৎ উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে এইসব লোক বিতাড়িত। গরু মোষ, ঘরবাড়ী ও কৃষিকর্মে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিনষ্ট। তাঁতিদের তাঁত, জেলেদের নৌকা ও জাল বিলুপ্ত।

কারখানায় কাজ বন্ধ। কলকব্জা হয় বিধ্বস্ত, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত। কাঁচামাল, গুদাম, তৈরী মজুদ পণ্য সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত। অভিজ্ঞ ম্যানেজার ও দক্ষ শ্রমিকের দল—যারা

অবাঙালী—স্থানত্যাগ করায় সেখানে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা। চা ও আখের জমি অগ্নিদগ্ধ। বনজঙ্গল কেটে উজাড়, কারণ গেরিলারা সেখানে লুকিয়ে থাকত। ফলে দেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ভারসাম্য বিপর্যস্ত।

যানবাহন ও যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, রেললাইন উৎপাটিত, বড় বড় সেতু, জাহাজ, খেয়া নৌকার ব্যবস্থা, রেলের মজুত যন্ত্রপাতি ও হাজার হাজার ট্রাক ও বাস ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট। সংবাদ আদানপ্রদান ব্যবস্থা প্রায় অচল। চাল্‌না ও চট্টগ্রামের দুটি বন্দর অংশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত ও 'মাইন' এবং নিমজ্জিত জাহাজে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বার্তাবহ যন্ত্রের তার ও বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চারক যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত।

স্কুল ও কলেজগৃহ, ছাত্রাবাস, গবেষণাগার ও বই সমূলে বিনষ্ট হওয়ায়, শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা অতি শোচনীয়। বেশীর ভাগ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা পণ্ডিত, সাংবাদিক ও লেখক নিহত। অল্পসময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে শিক্ষা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কর্মী তৈরী করার মত বুদ্ধিজীবী পথপ্রদর্শকের একান্ত অভাব। প্রাণহানিজনিত লোকশক্তি ক্ষয়ের অনুমিত মূল্য তিন কোটি টাকা। অনাথ শিশু, অবাঞ্ছিত সন্তানসহ অথবা গর্ভধারণের বিভিন্ন দশায় অত্যাচারিত মেয়েরা, নিঃস্ব বিধবা, পঙ্গু পুরুষ ও হিংসাত্মক আচরণে অভ্যস্ত তরুণদল—নবজাত সরকারের সামনে দায়িত্ব এল এদের পুনর্বাসনের। সংখ্যায় তারা বেশ কয়েক হাজার।

আর্থিক সঙ্গতির অবস্থা অতিশয় সঙ্গীন। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ লুণ্ঠিত, প্রায় 358 কোটি টাকা খোলা বাজারে ছড়ানো। এই টাকার দায় সরকারকে স্বীকার করতে হল। ইউনাইটেড নেশনস্ রিলিফ অপারেশনস্ (ঢাকা) এই নয় মাসের পাকিস্তান সামরিক সন্ত্রাসরাজত্বে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে দেখেছেন যে, ক্ষতির বহর প্রায় 10,000 কোটি টাকা। সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের হিসাব ধরা হয়েছে 3,000 কোটি ডলার, বাংলাদেশের মোটামুটি এক বছরের জাতীয় উৎপাদনের প্রায় সমান।

আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা ভয়াবহ। প্রায় 80,000 হিসাববহির্ভূত অস্ত্রশস্ত্র সারা দেশে ছড়ানো। তার কারণ, পাকিস্তানীরা দরাজহাতে তাদের সহযোগীদের ও অর্ধ-ফ্যাসিস্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অস্ত্র বিলিয়েছিল। আসলে যা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর এক প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র, তার পক্ষে এত বৃহৎ ও প্রচণ্ড সমস্যার মোকাবিলা করার উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। শাসনবিভাগ, আইনের প্রয়োগকর্তারা পেশাদারী সামরিক আমলাতন্ত্র, সকলেই সামরিক একনায়কত্বের অধীনে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের ঐতিহ্য জনগণের সঙ্গে শত্রুতা করা, তাদের শেখানো হয়েছে রাজনীতিকদের সম্পর্কে অবজ্ঞা পোষণ করতে। তারা সুসংগঠিত, শেখ মুজিব ও মুষ্টিমেয়

জাতীয় নেতাদের বাদ দিয়ে তারা নিজেরাই শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষমতা রাখে, এই বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তাদের রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষা পুষ্ট। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের শাসনকার্য পরিচালনার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, তাও প্রাদেশিক সরকারে অল্প সময়ের জন্য, যার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

এই বিপর্যয়ের সামনে প্রয়োজন ছিল একটা ঐক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ জনগণের রাজনৈতিক দল অথবা নানা দলের মিলিত গোষ্ঠীর, যাদের একটা সংগঠিত গণভিত্তি আছে। আর দরকার ছিল হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর, যারা পরিকল্পনা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্রে চিন্তাপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে পারে। মুক্তিসংগ্রাম এত স্বল্পকালস্থায়ী ছিল, (এ ছাড়া অন্যরকম হতে পারত না), একটা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বিপ্লবী মতবাদে একনিষ্ঠ কর্মীদল গড়ে ওঠার সময় তখন ছিল না। আওয়ামী লীগ ছিল একটা নানা শ্রেণীভুক্ত, নিরাকার দল। যার মধ্যে গ্রামীণ পাতিবুর্জোয়াদের প্রাধান্য। মুজফ্‌ফর আহমেদের নেতৃত্বের জাতীয় আওয়ামী পার্টি ছিল আওয়ামী লীগেরই বামপন্থী প্রতিরূপ, এবং শহুরে পাতিবুর্জোয়া প্রবণ। কম্যুনিস্ট পার্টি, সর্বদাই গুপ্তভাবে কাজ করতে বাধ্য হওয়ায়, সংখ্যায় অতি কম। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থী ও চরম বামপন্থী দলগুলির কোন স্থান ছিল না। অতএব এই অবস্থায় বিপ্লবের প্রক্ষেপণে শুধু সরকারের পরিবর্তন হল, যার পরিণাম হল একান্ত শোচনীয়।

বহু অবাঞ্ছনীয় গোষ্ঠী, যথা সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানপন্থী দলের পক্ষে এই আবহাওয়া ছিল অতি অনুকূল। তাদের পক্ষে শুধু টিঁকে থাকা সম্ভব ছিল তাই নয়, জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে তারা অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। আয়ুবশাহীর আমলে সুপরিকল্পিতভাবে সযত্নলালিত মধ্যবিত্তের কর্মজীবনে উন্নতির লালসা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। সুতরাং যেসব লোক মুক্তিসংগ্রামের ধারেপাশেও ছিল না তারা ক্ষমতাবানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধা সাজার চেষ্টা করল। সঙ্কীর্ণ মধ্যবিত্তশ্রেণীনির্ভর বহির্বিশ্ববিমুখ সমাজে এ ঘটনা ছিল অনিবার্য। শেখের প্রতি নিছক ব্যক্তিগত, তথাকথিত আনুগত্যের ভিত্তিতেও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

জাতীয়তাবাদ তার নিজস্ব সত্তাকে চিহ্নিত করার এবং তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে সংগঠিত করার আগেই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ফলে প্রায় সমস্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীকে আবার সেই আত্মপরিচয়ের প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হল। তারা যদি বাঙালী হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে তাদের প্রভেদ

কোথায়? আর তারা যদি মুসলমান হয়, তবে পাকিস্তানের ইসলাম গণতন্ত্র থেকে তাদের বিচ্যুতি কোন্ ভবিষ্যতের সূচনা করে? হিন্দুরা আর অর্থনীতিগতভাবে শক্তিশালী না থাকায়, সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক ভিত্তিটা বিদূরিত। পুরাতন অভ্যাস ও ভীতি ধীরে ধীরে প্রশমিত হওয়ায়, মুক্তিসংগ্রামে অর্জিত রাজনৈতিক আত্মপরিচয় থেকে স্বতন্ত্র এক জাতীয় আত্মপরিচয়ের সন্ধান শুরু হল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে সাম্প্রদায়িক আত্মপরিচয়ের চিন্তার অনুপ্রবেশ। অথচ তা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের আমূল বিরোধী, অতএব যথার্থতঃ গ্রহণযোগ্য নয়। বিপ্লব এইভাবে জন্ম দিল এক দ্বিধাজর্জরিত জাতিকে।

এই জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে, শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ অধিকার স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ায়, (পাকিস্তানের শাসনকালে অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষকে বেছে বেছে হত্যা করা একটা নিয়মিত ঘটনা ছিল) তিনি চেয়েছিলেন এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে। স্বাধীনতার মাত্র কয়েকমাস পরে, গণভবনে, তাঁর সরকারী বাসস্থানে, বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন :

> "বহু দশক ধরে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা, দারিদ্র্য ও দুর্দশার কারণ হয়ে এসেছে। 1947 সালে দেশবিভাগের পরে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকতার রূপ দেওয়া হয়। এটা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ফল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ড এখন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হল। ভারত-বিদ্বেষ সেই রাষ্ট্রগত সাম্প্রদায়িকতাবাদের মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীন, জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অভ্যুদয় শতাব্দীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও অভিশপ্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঘোষণা। আমরা যদি সর্বশক্তি দিয়ে বাংলাদেশের এই ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি রক্ষা করতে সক্ষম হই, তবেই এই উপ-মহাদেশে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দারিদ্র্য ও দুর্দশা মোচনের জন্য শান্তি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এক অনিবার্য পূর্বশর্ত।"

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার কাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কেও শেখ অবহিত ছিলেন। নির্বাসিত সরকার ঘোষণা করেছিলেন, সমাজবাদই তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারের তাৎক্ষণিক দায়িত্ব হল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসন, একটা স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিস্থাপন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা।

নবজাত জাতিকে সদ্যলব্ধ সমস্যাগুলি সামলানোর কাজে সাহায্য করার জন্যে বিদেশী সাহায্যের বন্যা এল। ভারত এগিয়ে এল প্রধান সাহায্যকারী হিসাবে। যদিও তিনমাসেরও কম সময়ের মধ্যে তার সামরিক বাহিনী দেশত্যাগ করল, প্রায়-দুর্ভিক্ষের অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে ভারত, সীমান্তের ওপার থেকে ত্বরিতগতিতে খাদ্য সরবরাহ করল। খাদ্যের পরিমাণ অন্যান্য সমগ্র বিদেশী সাহায্য-প্রাপ্তির প্রায় সমান। প্রথম চার মাসে, দান অথবা ধার হিসেবে, বৈদেশিক মুদ্রায় 170 কোটি টাকা—অন্যান্য সমস্ত জাতির সার্বিক সাহায্যদানের শতকরা 39 ভাগ—ভারত থেকে এসেছিল। এর ভেতরে বৈদেশিক মুদ্রায় ছিল 9.5 কোটি টাকা। একবছরে সামগ্রিক ভারতীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল 200 কোটি টাকা। বাংলা-দেশের সাংবাদিক এস. এম. আলি এই বিপুল সাহায্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আধুনিক এশিয়াতে, উত্তর ভিয়েৎনামকে চীন-সোভিয়েত সাহায্যের কথা বাদ দিলে, আর কোথাও এর নজির নেই।" ভারতের সামরিক ও বেসামরিক পূর্তবিদরা বন্দরগুলিকে 'মাইন' মুক্ত করে, সেতু, রেললাইন ও সংবাদ আদানপ্রদান ব্যবস্থাগুলির মেরামত করে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেন।

এই বিপুল মাত্রায় সাহায্য এবং অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকার গ্রহণ করা সত্ত্বেও, জনগণের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে পুনর্বাসন ও পুনর্নিমাণের কাজ অতি মন্থর ছিল, তাদের প্রত্যাশা মেটা তো দূরের কথা। যেহেতু অধিকাংশ শিল্প পাকিস্তানীদের মালিকানায় ছিল, সরকারের পক্ষে সেগুলির জাতীয়করণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সে কাজ নিষ্পন্ন করতে গিয়ে কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীও ক্ষতিগ্রস্ত হল। জাতীয়করণের কর্মসূচীকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যে অগ্রিম কোন প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো খাড়া করা হয়নি। তার ফলে, ব্যবস্থাপনার শূন্যতা ভরাট করতে গিয়ে প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা 80 ভাগ ক্ষেত্রে সরকারকে নির্ভর করতে হল কিছু আমলা ও পূর্বতন মালিকদের উপরে (যাদের জাতীয়করণ কর্মসূচীতে কোন বিশ্বাস ছিল না)। অতএব, স্বভাবতঃই কর্মতৎপরতার ব্যাপক অভাব ও ইচ্ছাকৃত অন্তর্ঘাত দেখা দিল, যা আবার আভ্যন্তরীণ বাজারে ও রপ্তানীর পণ্যে ঘাটতি সৃষ্টি করল। প্রস্ফুটোন্মুখ বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের বর্ধিষ্ণু উচ্চাকাঙ্খার পথে গণ্ডী বেঁধে দেওয়ায় রুষ্ট হল।

আয়ুবশাহীর সরকার অনুমোদিত দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়ায় লালিত বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পাকিস্তানীদের বিতাড়ণের দরুণ সৃষ্ট শূন্যতার ত্বরিত সুযোগ গ্রহণ করল। একটা নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রস্তুত হবার আগেই তারা

নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিল। যেহেতু বিদেশে বেচাকেনা সম্পর্কে তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হল, ও সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাজারেও পণ্যের অভাব দেখা দিল। কোনরকম অভিজ্ঞতাবর্জিত, অথচ অপরিমিত লোভসম্পন্ন একটা নতুন বণিকশ্রেণী অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে আরও ঘনীভূত করল। এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি-বিড়ম্বিত বহির্জগতের সঙ্গে অসম বাণিজ্য একটা ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি ঘটাল। 1974 সালের মে মাস নাগাদ মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনধারণের খরচ শতকরা 184 ভাগ বেড়ে গেল। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিন্তু ঠিক সেই সঙ্গেই হঠাৎ-ধনীর দল তাদের ধনরত্ন জাহির করে বেড়াতে লাগল।

কৃষিবিভাগে, দ্বিধাগ্রস্ত ভূমিসংস্কার ধনী কৃষকদের অসন্তোষ উৎপাদন করল, অন্যদিকে ভূমিহীন ও ভাগচাষীদের জমির ক্ষুধা মেটাতে পারল না। মূল্যবৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকরাও বিপন্ন হল, কারণ মজুরি উপযুক্ত হারে ক্ষতিপূরণ করল না।

রাজনীতির কর্তৃত্ব যেখানে সবার উপরে, সেখানে আমলাতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে বিমর্ষ। এদিকে অভিজ্ঞ সহকর্মীর অভাবে শেখকে আরও বেশী করে সেই আমলাদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হল। অবস্থা আরও সঙ্গীন হল, তাঁর মন্ত্রীসভার একমাত্র দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, জাতীয় মর্যাদার উপযুক্ত সহকর্মী তাজউদ্দীন আহ্‌মেদের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের ফলে। তাজউদ্দীন আহ্‌মেদ ছিলেন চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নির্বাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী। শেখের একটা ভিত্তিহীন ভয় হয়েছিল যে তাজউদ্দীন আহমেদ একটা বিকল্প ক্ষমতাকেন্দ্রের মধ্যবিন্দু হয়ে দেখা দেবেন। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্ল্যানিং কমিশন প্রায় অচল হয়ে পড়ল। সেখানে বিদেশে শিক্ষিত অর্থনীতিকদের এক গোষ্ঠী কাজ করছিলেন, এবং এঁরাই একমাত্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে স্বাধীনতার আগেও কিছুটা চিন্তা করেছিলেন। আমলাতন্ত্র এই প্ল্যানিং কমিশনের বিরোধী ছিল। সুতরাং প্ল্যানিং কমিশনের মন্ত্রী হয়েও তাজউদ্দীনের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ছিল না।

সামরিক আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছিল সশস্ত্র ডাকাতদের, চরম বামপন্থী ও ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত ধরে সক্রিয় চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভাগ দেওয়া হচ্ছিল না, ফলে তারা ছিল ক্ষুব্ধ। সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে শেখের অস্বীকৃতির দরুণও তারা মোটেই খুশী ছিল না। শেখ নির্ভর করছিলেন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিবদ্ধ বন্ধুভাবাপন্ন ভারতের উপরে। সামরিক

আমলাদের ধারণা হল যে বিপ্লবের ফলশ্রুতি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গফ্ফর চৌধুরীর বক্তব্য স্মরণযোগ্য, যে, 1965 সালে পাকিস্তানের পরাজয়ের পরে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিছু লোক পূর্বাংশে একটা অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনা করেছিল, শেখ তার বিরোধিতা করেন।

নানা ধরণের ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট লোকজনের কৃপায় অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা, এবং অভিজ্ঞ যৌথ নেতৃত্বের অভাব—আরও বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিভেদসৃষ্টিকারী প্রবণতার আবির্ভাবে। একদিকে শত্রুপক্ষের সহযোগী ও অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা—এই প্রশ্নের উপরে সমস্ত জাতি যেন সোজাসুজি বিভক্ত হয়ে গেল। সেই বিভাজন পৌঁছে গেল বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্র পর্যন্ত, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রত্যাবর্তনের পরে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হবার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠন ও প্রকাশ্যে আবির্ভাব সম্ভব হল। এই সুযোগে অননুমোদিত সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলি নিজেদের সুসংগঠিত করল। আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুবসংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ও সামরিক বিভাগের কিছু লোকজন নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নামে চীনঘেঁষা ও কিছুটা ভারতবিদ্বেষী এক বামপন্থী দলের সংগঠন রাজনৈতিক বিভেদকে আরও জটিল করে তুলল।

আওয়ামী লীগের মধ্যেই প্রচুর অসৎ লোক ছিল, শুধু শেখের ব্যক্তিত্বের মহিমা তাকে টেনে নিয়ে চলেছিল। গণতান্ত্রিক প্রথা গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, পাকিস্তানের আমলে রাজনীতিতে যে দমননীতি, হুমকিবাজি, এমনকি হিংসাত্মক আক্রমণের চলন ছিল, তার কোন ব্যতিক্রম হল না। নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে লোকসভার নির্বাচনের সময় অহেতুক কারচুপির আশ্রয় নেওয়া হল, যার ফলে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করল। একটা গ্রহণযোগ্য গণতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠনের সম্ভাবনাকে আমলই দেওয়া হল না। কম্যুনিস্ট পার্টি ও মুজফ্ফর আহ্মেদ পরিচালিত জাতীয় আওয়ামী পার্টি, এই দুই বামপন্থী দল শেখের প্রগতিশীল নীতিকে সমর্থন করলেও, স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে বিকশিত হতে অপারগ হল। এই শূন্যস্থানকে স্বভাবতঃই পূর্ণ করল এসে কতিপয় সুবিধাবাদীদের সংযোজন, খোলাখুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদী থেকে বিভিন্ন বর্ণের বামপন্থী সুযোগসন্ধানী পর্যন্ত।

মুক্তিসংগ্রামের বিশৃঙ্খলাজাত অসৎ ও নব্য ধনিক গোষ্ঠী প্রশাসনের বিক্ষুব্ধ দলের সঙ্গে যোগ দিল ; উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা। পেশাদার ডাকাত ও চরমপন্থী রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র আক্রমণ গ্রামাঞ্চলে

নিরাপত্তার অভাববোধ সৃষ্টি করল। বন্যা অথবা খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের তৈরী সমস্যার সঙ্গে এসে যোগ দিল। এই সমস্ত ঘটনার পুঞ্জীভূত আঘাত দেশের অর্থনীতিকে প্রায় অচল করে দিল।

আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, একটা স্থায়ী রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র স্থাপনের সহায়ক ছিলনা। শেখ তাঁর বৈদেশিক নীতির ভিত্তি হিসেবে জোট-নিরপেক্ষতা গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল অবশ্যম্ভাবীভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, মুক্তিসংগ্রামকালে তাদের অকুণ্ঠ সহায়তার দরুণ, একটা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। একই সঙ্গে, ভৌগোলিক অবস্থানের বাধ্যবাধকতা দাবী করছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতার বন্ধন। তেমনি, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা দাবী করছিল আরব দেশগুলির সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতা। আর বাংলাদেশকে যে শক্তিশালী দেশ প্রায় বেষ্টন করে আছে, সেই ভারত সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের এক বৃহৎ অংশের ভীতি দূর করার জন্যে, শেখ চেষ্টা করলেন চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক রাখতে। পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম জর্মানীর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখলেন। যদিও বিশ্বব্যাঙ্ক বা ঐ ধরণের আন্তর্জাতিক আর্থিক ও অন্য সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির পরামর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল কোনরকম দরকষাকষির উর্ধ্বে। যেসব দেশ বাংলাদেশের মুক্তির বিরোধিতা করেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের প্রভাব তাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছিল। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এইসব দেশের সরকাররা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করেছিলেন।

শেখের রাজনৈতিক কর্মপন্থার নিজস্ব ভঙ্গীও রাজনৈতিক প্রায়-অচল-অবস্থার দিকে তাঁর অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। পুরোন রাজনীতির চালচলন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। তাঁর অভ্যাস ছিল এক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে অপর এক গোষ্ঠীর পিছনে লাগিয়ে দেওয়া, আবার প্রত্যেককেই তিনি নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পৃথক পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতেন। এই ধরণের অবস্থা দলীয় ঐকমত্য গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল নয়, বিভিন্ন সমচিন্তাশীল দল—যথা কম্যুনিস্ট পার্টি ও মুজফ্‌ফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী পার্টির সঙ্গে ঐক্যভাবনা তো দূরের কথা। প্রকৃতপক্ষে, শেখ যে চূড়ান্ত কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেখানে প্রগতিশীল নীতি কার্যে পরিণত করার জন্যে এবং তাঁর নিজের ঘনিষ্ঠ লোকজনের

মধ্য থেকে দুর্নীতি সমূলে দূর করার জন্যে যথেষ্ট নির্মম হতে পারেন নি। তিনি এমন একটা অবস্থার জালে জড়িয়ে পড়লেন যা অংশতঃ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি।

এই অবস্থা থেকে শেখ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর ইচ্ছা ছিল, রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশবাসীকে একমুখী করা। এই-ভাবেই একটা একক দলীয় শাসন, ও গ্রাম পর্যন্ত একটা সুসংহত কাঠামোকে উপর থেকে বসিয়ে দেবার ভাবনা জন্ম নেয়। এই কাঠামোর পরিচালকশক্তি রাজনৈতিক কর্মী। এবং এর ভিত্তি সমবায়ী কৃষি-অর্থনীতি ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্প।

পরিবর্তনের ধারা স্বভাবতঃই মন্থর ছিল, বিশেষ করে এই কারণে যে শেখ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভারসাম্য আনতে চেষ্টা করছিলেন। তিনি বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রাশে আনার জন্যে তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তাঁর নবগঠিত দল বাংলাদেশ আওয়ামী কৃষক-শ্রমিক লীগের মধ্যে স্থান দিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের জাতীয় আওয়ামী পার্টি এই নতুন পার্টির অঙ্গীভূত হয়ে গেল। এই পরিবেশে ক্ষমতার কাঠামোতে আদর্শগত দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছতা হারাল। নতুন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে কাঠামোগুলি যখন গড়ে তোলা হচ্ছিল, তখন রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রে কার্যতঃ একটা শূন্যতা দেখা দিল।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে, নতুন রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতি প্রয়োগের ঠিক এক-পক্ষকাল আগে, সামরিক 'ক্যু' ঘটল, এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। তার কয়েকমাস পরে খুন করা হল দেশের অন্যান্য সর্বোচ্চ জাতীয় নেতাদের।

একদিক থেকে, বাংলাদেশের বিপ্লবের চাকা সম্পূর্ণ ঘুরেছে। বাংলাদেশের শহর এবং গ্রামে পাতি-বুর্জোয়াশ্রেণী তথা বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের যে অবাধ রাজনৈতিক ক্ষমতার বহুকালের স্বপ্ন, তা অবশেষে পূর্ণ হল। আবদুল গফ্‌ফর চৌধুরীর ভাষায় : প্রাক-স্বাধীনতা ভারতে ফজলুল হক বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন ; আয়ুব তাকে দিলেন অবাধ ব্যয়ের স্বাদ ও অভিজাত দুরাকাঙ্ক্ষা ; মুজিব তাকে পৌঁছে দিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার দরজা পর্যন্ত ; এঁদের প্রত্যেককেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণী শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে। □

দশ

কোথায় আগামীকাল ?

মানুষ নিজের ইতিহাস রচনা করে, কিন্তু নিজেদের পছন্দসই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তা করে না, করে অতীতের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত, প্রদত্ত ও হস্তান্তরিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। সমস্ত মৃত পূর্বসূরীর ঐতিহ্য জীবিতের চিন্তাধারার মধ্যে দুঃস্বপ্নের মত বোঝা হয়ে থাকে।

—কার্ল মার্কস, 'দি এইট্টিন্‌থ্‌ ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্টি' (1852)

আজকে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্র। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে এই দুই অংশের মধ্যে একটা মৈত্রীবন্ধন গড়ে উঠেছিল। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এখন এদের মধ্যে সামরিক নেতৃত্ব প্রধান ভূমিকা পালন করছে। দেশের মুক্তি অর্জনের পরে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি দ্বারা যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, রাষ্ট্রপতির অনুশাসন অনুসারে তাতে কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল এই যে, ধর্মনিরপেক্ষতা আর মৌলিক নীতির একটি অঙ্গ হিসাবে গণ্য হল না। অপরাপর পরিবর্তন নির্ভর করল পরবর্তীকালে চূড়ান্তভাবে কী রাজনৈতিক কাঠামো বেরিয়ে আসে তার উপরে। আয়ুব-ঐতিহ্য অনুসারে নিম্নস্তরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে কিছুটা বেসামরিক সমর্থনের দ্বারা সামরিক শাসনকে বিধিসম্মত করা, একটা বেসামরিক মন্ত্রীসভার প্রবর্তন, ও জেনারেল জিয়া কর্তৃক এক নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি,—এসবের শেষ পর্যায়ে সাধারণ নির্বাচন হয়। বলা যেতে পারে, এতে নির্বাচিত লোকসভার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থাও বৈধতাপ্রাপ্ত হল। জেনারেল জিয়ার নবগঠিত জাতীয়তাবাদী দলেরও ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল তাই।

এই অবস্থায় নতুন জাতীয় পরিচিতির সন্ধান করতে গিয়ে শাসকশ্রেণীরা পাকিস্তান

সম্পর্কে বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন। এই প্রস্তাবে ছিল, উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বদিকে "স্বাধীন রাষ্ট্র" চাই। বহুকাল ধরে বাঙালী মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতারা একে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের একটা অংশ এই ব্যাখ্যার উপরে বিধৃত। স্বাধীনতার পরে এরাই মত প্রকাশ করে যে এতদিনে লাহোরে গৃহীত প্রস্তাব সঠিক-ভাবে কার্যে পরিণত হয়েছে। আসলে যা বেরিয়ে এল, তা হল দুটি পাকিস্তান। দ্বিজাতিতত্ত্ব-মতবাদের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠল না। এই মতবাদের মধ্যে শাসকশ্রেণীর পিছনে দেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার সুপ্ত সম্ভাবনা বর্তমান। তবে যে-সমাজে ধর্ম এক বৃহৎ একত্রীকরণের শক্তি এবং বহু রক্তপাত ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদ কিছুটা অস্পষ্ট নিরাকার ভাবনা, সেখানে এই মতবাদের ধর্ম ও জাতীয়তাবাদকে যুক্ত করার ক্ষমতার মূল্য সন্দেহাতীত নয়। তবু বাংলাদেশের মুক্তির বাস্তব সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দ্বিজাতিতত্ত্বের অর্থনৈতিক ভিত্তি ইতিমধ্যে অপসারিত। কারণ বাংলাদেশে হিন্দুরা অর্থসম্পদে আর উচ্চশ্রেণী নয়। যেহেতু সাম্প্রদায়িকতার কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই, অতএব স্বভাবতঃই তা ভারতবিরোধের সঙ্গে সমার্থ হয়ে দাঁড়ায়। শাসকশ্রেণীর কিছু অংশের ও সাধারণ মানুষের ভারত-বিদ্বেষ অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পুরাতন সংস্কার মরেও মরে না। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নততর চরিত্র সম্পর্কে অবধান, অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভীতিকে আরও বর্ধিত করেছে। তাছাড়া, একটি ক্ষুদ্রায়তন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশ যখন এক বৃহত্তর, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী দেশের দ্বারা প্রায় চতুর্দিকে বেষ্টিত, তার পক্ষে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এবং এই ভয়কে উস্কিয়ে দেবার মত অতি-আগ্রহী ক্ষমতাবানদেরও অভাব নেই।

এই ধরণের পরিস্থিতিই সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচিয়ে রাখে, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কতে ফাটল ধরায়। বদরুদ্দীন উমর অতি সঠিকভাবে বলেছেন যে পঁচিশ বছর ধরে পাকিস্তানী প্রচার সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতবিদ্বেষের মধ্যে কোন তফাৎ রাখেনি। তিনি আরও বলেছেন: "ভারতবিরোধী প্রচারণা অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় পরিণতি লাভ করতে পারে এবং সেটা হলে তার রাজনৈতিক ফলাফল অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের হাতকে জোরদার করতে বাধ্য।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমালোচক হলেই তাকে সাম্প্রদায়িক সাব্যস্ত করা অথবা কেবল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীদের মাঝখানেই মিত্র অন্বেষণ করা ভুল

হবে। অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ আছেন, যাঁরা মনে করেন যে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব। আবার অনেক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি আছেন যাঁরা ভারতকে প্রধান শত্রু বলে বিবেচনা করেন।

স্পষ্টতঃই আজকের বাংলাদেশে দুই বিবদমান শক্তি বর্তমান। তাদের বেছে নিতে হবে : হয় আধুনিকতা অথবা আরব ঐতিহ্যের অবাস্তবতা, গণতন্ত্র অথবা একনায়কত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতা।

এ থেকেই বোঝা যায় জেনারেল জিয়ার অনুগামীদের মধ্যে ধর্মান্ধ, অতিরক্ষণশীল মনোবৃত্তির সঙ্গে বাম চরমপন্থীদের একত্র সমাবেশ কেন। চিরাচরিত বামপন্থী দল, যথা কম্যুনিস্ট পার্টি ও মুজফ্‌ফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী পার্টি, বিকল্প হিসেবে দলবদ্ধ হবার চেষ্টা করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক অংশ শেখ মুজিবের তন্নিষ্ঠ অনুগামীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে নিজেদের প্রকাশ করতে চাইছিল। সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক জোট বাঁধার ব্যাপার তখনও পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়, যদিও ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

সামরিক একনায়কত্ব বহু উন্নয়নশীল দেশেরই সাধারণ বিশেষত্ব। 'অতীতের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত, প্রদত্ত ও হস্তান্তরিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার' উপরে নির্ভর ক'রে তাদের মধ্যে কোন কোন দেশ সমাজবাদের পথে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অবশ্য 'সমস্ত মৃত পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য' আরও বেশী রক্ষণশীলতার প্রবণতা নির্দেশ করে বলে মনে হয়। 1976 সালের ডিসেম্বরে, ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যে, জেনারেল জিয়া উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গীর এক চিত্র নিবেদন করেন। তাঁর লক্ষ্য শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ মোট জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা 4.5 পর্যন্ত অর্জন করা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্ধেক করতে হবে। তাহলে মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে শতকরা তিন ভাগ বেশী। দারিদ্র্যের পরিমাণ শতকরা 80 থেকে 20 তে নামিয়ে আনতে হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন 1980-81 পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। যাতে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলি থেকে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যবস্থাকে আমূল পুনর্বিবেচনা ক'রে উন্নতিসাধনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উপযুক্ত করা যায়। ক্রমোন্নতির নতুন কৌশলের বিবর্তনের অভিমুখে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকে ন্যূনতম অবস্থায় আনা ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগের জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা দেওয়া। দুই

শতাধিক ছোট এবং মাঝারি শিল্পগুলিকে বি-জাতীয়করণ করা হয়। কাগজ, সিমেন্ট, তেল ও গ্যাস প্রভৃতি সরকারী খাতের শিল্পগুলিতে ব্যক্তিগত লগ্নীকরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আহ্বান করা হয়। ধাপে ধাপে বিনিয়োগের উপরে ধার্য আর্থিক সর্বোচ্চ সীমাকে দূরীভূত করা হয় ও আয়কর সংক্রান্ত বহু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। উন্নত কারিগরীজ্ঞান ও রপ্তানীপ্রধান শিল্পের ব্যাপক ক্ষেত্রে উদার বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতি বিদেশী মূলধনকে সাদর আহ্বান জানায়। আমদানীর উপরে বাধা শিথিল করা হয়। 1976 থেকে 1978 সালের মধ্যে 1.4 কোটি ডলার খরচ-সাপেক্ষ কুড়িটি শিল্পসংক্রান্ত প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়।

1978 সালে ঘোষিত দ্বিবার্ষিকী অন্তর্বর্তী পরিকল্পনার জন্য 257.4 কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিপুল বিনিয়োগ কার্যক্রমের জন্য এই অর্থ থেকে 31.2 কোটি ডলার ধার্য করা হয়। এর অন্তর্গত বৈদেশিক মুদ্রা প্রায় 1.5 কোটি ডলার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হবার আগে, 1978 থেকে 79 এবং 1979 থেকে 80 সালের ভেতরে বারোটি প্রধান শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে 139টি শাখা ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্প্রসারিত হবে, এই রূপ আশা করা হয়। উদ্দেশ্য, শিল্পকে অনুন্নত অঞ্চল ও গ্রামীণ কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া। বছরে 133 কোটি ডলার মূল্যের পণ্য উৎপাদন, এবং প্রায় 65,000 মানুষের কর্মসংস্থান এর লক্ষ্য ছিল।

পরিকল্পনা কমিশন অনুসারে ভূমিসংস্কার, সরকারী-বেসরকারী খাতের পরস্পর সম্পর্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তখনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। তা না হওয়া পর্যন্ত, বাস্তবানুগ, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকার্য আরম্ভ করা সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু সম্ভাব্য কর্মপন্থার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুমান করা যায় যে, মূল কর্মকৌশলের চরিত্র, সমস্ত তৃতীয় জগৎ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের অভিমত অনুযায়ী, কৃষি ও শিল্প-উন্নয়নকে রপ্তানীনির্ভর করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়েছে যে শিল্পোন্নয়নের এমন একটা নক্সা গ্রহণ করতে হবে 'যার উপরে সফল রপ্তানীর বিস্তার নির্ভর করতে পারে।' তার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে এইভাবে : পাট শিল্পের উন্নততর ফলপ্রদতা, ইতিপূর্বেই রপ্তানীকৃত ছোট এবং কৃষিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্যের অধিকতর বিস্তৃতি, এবং এমন ধরণের নতুন রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উন্নতিসাধন, যার স্থানীয় সম্পদের সুবিধা আছে।

অর্থ, কারিগরী ও উদ্যোগ সংক্রান্ত কুশলতা, রপ্তানীর বাজার নির্ণয়, পণ্য বাজারীকরণের জ্ঞান, চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও প্রচার ব্যবস্থা—এইসব ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাংক বিদেশী সাহায্যের আশ্বাস দেয়। দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর

দেওয়া হয় গ্রামোন্নয়নের উপরে। সমগ্র ধার্য অর্থের শতকরা 83 ভাগ চলিষ্ণু প্রকল্পগুলির উপরে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিকল্পিত সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির শতকরা 72 ভাগের খরচ আসে প্রায় 144 কোটি ডলার বিদেশী সাহায্য থেকে। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণাসংস্থা ও বিশ্বব্যাংক একটা পূর্ণাঙ্গ কৃষিনীতি নির্ধারণ করে যার মধ্যে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, সরকারী ক্রয় ব্যবস্থা, খাদ্য আমদানী, শহরের প্রয়োজনে খাদ্য সংবিভাজন ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত।

আজকে বাংলাদেশের সহায়তায়, অন্য যেকোন দেশের তুলনায় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। সমগ্র বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ 1973-74 সালে ছিল মাত্র 19.8 কোটি ডলার। 1977-78 সালে সেটা পৌঁছয় 646.9 কোটি ডলারে, যার মধ্যে শতকরা 56.7 ভাগ অথবা 366.64 কোটি ডলার ছিল অনুদান। চলতি সরকারী ঋণের পরিমাণ পৌঁছয় 285.82 কোটি ডলারে। মাথাপিছু বিদেশী ঋণ 80 ডলার। এই হিসাবের মধ্যে প্রধানতঃ চীন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত সুবিশাল সামরিক সাহায্য গণ্য হয়নি। বিদেশী সাহায্যের উপরে এইধরণের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণ প্রধানতঃ বাণিজ্যের ভারবৈষম্যের অবিরত বৃদ্ধি, যার পরিমাণ 81 কোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছয়। এইসময়ে বৃহত্তম ঋণদাতা যুক্তরাষ্ট্র, তারপরে জাপান, পশ্চিম জর্মানী ও কানাডা।

অর্থনীতিকে নতুন লক্ষ্যপথে পরিচালনা করার প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হয়। 1977-78 সালের 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ'এর মতানুসারে, কাঠামোগত পরিবর্তনের দরুণ অর্থনৈতিক সবলতা ও স্থায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই মূল্যায়ন সমর্থিত হয় 1977 সালে বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক বিবরণীতে :

> "সুস্থিতিমূলক কর্মসূচী প্রথম প্রবর্তন করার পরে, গত দুই বৎসরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করেছে। এই কর্মসূচীতে আছে ঋণনিয়ন্ত্রণ ও (প্রচুর বিদেশী ঋণের সাহায্যে) ঘাটতি অর্থসংস্থানের বিলোপ। এর সঙ্গে যুক্ত আই. এম. এফ-এর সঙ্গে একটা আপৎকালীন ব্যবস্থা অনুসারে আমদানী সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার কিছুটা শৈথিল্য। এই কর্মসূচীর আগে টাকার মূল্য শতকরা 58 ভাগ কমান হয়েছিল। বাংলাদেশের (অর্থনৈতিক) স্থায়িত্ব প্রচেষ্টা সফল হয়েছে : খাদ্যে ঘাটতি কিছুটা আয়ত্তাধীন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত, রপ্তানী আয়তনে প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে (যদিও মূল্যে ততটা নয়), ঋণপরিশোধের ঘাটতি, যদিও এখনও প্রচুর, তবু সেখানে বকেয়া অর্থের পরিমাণ কম, আর্থিক বৎসর 1976 সালে সর্বাধিক খাদ্য উৎপাদনের একটা কারণ অনুকূল আবহাওয়া ;··· সতর্ক অর্থসংক্রান্ত নীতিজনিত মজুত খাদ্যের ঘাটতি ও গ্রামীণ নিম্ন আয়ের দরুণ

আভ্যন্তরীণ চাহিদার অবনতি হওয়া সত্ত্বেও শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা প্রায় সাতভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। গত ছয় বৎসরে বহু গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক কাজে ও শিল্পোদ্যোগে স্বীকৃত বাধানিষেধের কথা স্মরণ রাখলে, সাম্প্রতিক প্রগতি একটা গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি।"

এতটা অনুকূল মূল্যায়ন সত্ত্বেও, বিশ্বব্যাঙ্কের কুশলীগণ একথাও বলেছেন যে, "কম উৎপাদন এখনও একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা।" শিল্পের খাতে, সিমেন্ট, ইস্পাত, সার, রান্নার তেল ও পাটের উৎপাদন বিভিন্ন অনুপাতে বর্ধিত হয়েছে। পাটের রপ্তানী বেড়েছে, কিন্তু টাকার মূল্য ও জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়ায় অর্থপ্রাপ্তির হার নিম্ন। আমদানী সম্পর্কে উদারনীতি হেতু ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বিশেষ ধরণের ভোগ্য-পণ্য ঢালাওভাবে আসতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পি. এল. 480 কর্মসূচী অনুসারে বিপুল সাহায্য সত্ত্বেও খাদ্যের আমদানী আরও বাড়তে থাকে। অথচ দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু পণ্যের উৎপাদন নিম্নমুখী, যথা সূতীবস্ত্র।

অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষতর প্রকাশ মূল্য সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে। কিছু সংখ্যক পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যথা সূতা, ঔষধ, সাবান, রান্নার তেল, সিমেন্ট, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, সিগারেট, চিনি, সার, রাসায়নিক দ্রব্য ও ইস্পাতের তৈরী দ্রব্য। প্রধানতঃ খাদ্যমূল্য কম হওয়ার দরুণ, তাছাড়া ভাল ফসল, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য, এবং বিশেষ করে শহর এলাকায় প্রচুর সরকারী সম্পূরক অর্থ মঞ্জুর হওয়ায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণের ব্যয়-তালিকা নিম্নগতি। এসত্ত্বেও বহু প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের দাম উর্ধগতি, যথা জ্বালানী, আলোর ব্যবস্থা, ঘরভাড়া, সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ বহু নতুন বন্ধু লাভ করে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি ঘটে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার মুসলমান জনাকীর্ণ দেশ হওয়ায় ইসলামীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান হয়। সৌদী আরবের মত কিছু কিছু অধিকতর রক্ষণশীল ইসলামী রাষ্ট্রের মনোভাব উষ্ণতর ও সহযোগিতায় অগ্রণী। মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সমর্থন ছিল না, তারাও এখন নিশ্চিতভাবে বন্ধুভাবাপন্ন। জেনারেল জিয়া ভারতের ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তোলেন, বিশেষ করে নেপালের সঙ্গে। এর ফলে, প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের উপরে যে নির্ভরশীলতা ছিল, তা অনেকাংশে কমে যায়।

শেখ মুজিবের হত্যার পর, কিছুদিনের জন্য অবস্থা অচল হয়। তার পরে, প্রধানতঃ সরকারী ও রাজনৈতিক পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। প্রথম দিকে আরব্ধ কিছু কিছু সহযোগিতার কর্মসূচীর কাজ চলতে থাকে। বেশ কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে; এর মধ্যে আছে, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা এবং ফিল্ম ও টি. ভি. ইনস্টিটিউট। সাংস্কৃতিক বিনিময়েরও একটা কর্মসূচী আছে, তবে গত কয়েকবছর সেটা বিশেষ কার্যকর নয়।

বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিছুটা মন্থর। ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এমন কিছু নেই, যা ভারতকে নেবার জন্য বলতে পারে, সেই সঙ্গে আছে অসম বাণিজ্যিক ভারসাম্য। তবে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নানাদিকে ছড়িয়ে দেবার বা আরও উন্নত করার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। পাকিস্তানী শাসন ও 1965 সালের যুদ্ধের পরে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের বিধ্বস্ত অবস্থা, ভারত-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের পূর্বতন পদ্ধতিকে অবশ্যই বদলে দিয়েছে। যে-যুগে পূর্ববাংলা শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাৎবর্তী কৃষি-অঞ্চল ছিল, দেশবিভাগের আগের সেই দিনগুলিতে ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও এটা বোঝা দরকার যে এখনও কিছুটা পরস্পরকে পরিপূরণের অবস্থা বর্তমান।

আবার সেইসঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও আছে, যথা পাট এবং চা সারা পৃথিবীর বাজারে রীতিমত কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই উপকৃত হবে, যদি তারা একটা গ্রহণযোগ্য সাধারণ নীতি স্বীকার করতে পারে। অন্যান্য দিকে সুস্থ প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দান করা ভাল। ভৌগোলিক নৈকট্য দুই দেশের অর্থনীতির পক্ষেই অত্যন্ত মঙ্গলকর, কারণ মালবহনের খরচ অনেকাংশে বাঁচে। পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে উন্নত করায় ভারতের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কিছু কাজে আসতে পারে।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে কয়লা, যন্ত্রপাতি, ও যানবাহনের সরঞ্জাম আমদানী করছে। আমদানীর পরিমাণ ও সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে। ভারতীয় কারিগরী বিদ্যা অর্থনীতিকে শিল্পায়ত করতে সাহায্য করতে পারে। মূলধনের অভাবের সমস্যা দূর হয়, ভারত যদি সেই শিল্পজাত দ্রব্য মূল্য হিসাবে পুনর্গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে। এই ব্যবস্থা, কাপড়, সিমেন্ট, চিনি ও সার ইত্যাদি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শ্রমমূল্য নিম্নমান হওয়ায় ভারতীয় যন্ত্রপাতির দাম কম। সহজে মেরামতের সুযোগ সুলভ। নিউজপ্রিন্ট, কাগজ ও

কাগজপিণ্ড, মাছ, মুরগী, কাঁচা পাট, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে তৈরী নাইট্রোজেনপূর্ণ সার ইত্যাদি ভারতের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার যথেষ্ট ক্ষমতা বাংলাদেশের আছে। ভারত এইসব শিল্পের বেশ কয়েকটিকে উন্নত করার জন্যে সাহায্য করতে পারে, এবং সেই সঙ্গে ইস্পাত, রবারজাত পণ্য ও তৈলশোধনেরও উন্নতি করতে পারে। ভারত থেকেও কিছু কাঁচা মাল পাওয়া যেতে পারে। এই ধরণের সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন উন্নয়নকৌশল সম্পর্কে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী। যার লক্ষ্য হবে আমদানী বিকল্প, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, ও সরকারী খাতের জন্য একটা বিশিষ্ট ভূমিকা।

সহযোগিতার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচকার্য, ও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে জলের ব্যবস্থার জন্য উভয় দেশে বহমান প্রধান নদনদীগুলির সদ্ব্যবহার। ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকলে, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ জলপথের মাধ্যমে ভারতের পূর্ব ও উত্তরপূর্ব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা সম্ভব। ইতিপূর্বেই এই উদ্দেশ্যে কিছু কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন বাংলাদেশ ও নেপালকে আমাদের দেশের ভেতর দিয়ে বাণিজ্য করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। □

এগার

এত কণ্ঠস্বর

যে সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের মাটির সম্পর্ক নেই, যে সাহিত্য দেশের অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষের কথা বলে না, সে সংস্কৃতি ও সাহিত্য চিরস্থায়ী হতে পারেনা।

—শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিসংগ্রাম যে-বাংলাদেশের জন্ম দিল, তার বহিরঙ্গ বিধ্বস্ত, কিন্তু অন্তরে একীভূত। এই প্রসঙ্গে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল, যাকে বলে ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার। আসলে তা ছিল মাতৃভাষায় অধিকারের দাবীর চেয়েও বেশী কিছু। সে আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল একটা জাতির ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। সেটা রূপ নিল, অতীতকে পুনরুদ্ধার করে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করার চেষ্টায়, কিন্তু অতীতের পুনঃপ্রবর্তনে নয়।

1947 সালোত্তর প্রজন্ম ধরা পড়েছিল দুই পৃথিবীর মাঝখানে : শহর এবং তার অদ্যাবধি প্রাসঙ্গিক গ্রামের সঙ্গে আত্মিক যোগ। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে গ্রামাঞ্চল তখনও সংস্কৃতির মাতৃভূমি। সে-উত্তরাধিকার ছিল জটিল, প্রথম দিকের উপজাতি, হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে পরবর্তী যুগের ইসলামের মিলন। এই উত্তরাধিকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। ঐতিহ্যের দিকে এইভাবে পিছন ফিরে তাকানোর অর্থ এই সাধারণ উত্তরাধিকারে বাঙালী মুসলমানের অবদানের নতুন করে অনুসন্ধান। পঞ্চাশ সাল নাগাদ, খ্যাতিমান লেখকদের, যথা নজরুল ইসলাম, মহম্মদ সুফিয়ান, এনামুল হক, কাজি আবদুল ওদুদ এবং আরও অনেকের এই বিষয়ের উপরে লেখা বই বেরোতে শুরু করল।

শহরে, সাধারণ মানুষের জীবনে, লোককথা-লোকগাথার একটা স্বাভাবিক বন্যা এল। এখানে কোন ছলনা ছিল না। আজও শহর-সীমার বাইরে শুনতে পাওয়া যায় রাখালদের বাঁশীতে বহু প্রাচীন গানের সুর বাজে। পদ্মার বুকে নৌকা বাইতে বাইতে মাঝির গান—ভেসে আসে। নদী পারাপারের প্রতীক্ষায় চায়ের দোকানে

বসে থেকে দেখা যায়, বাউল তার একতারায় ঝঙ্কার তুলে উদাত্ত গলায় গান ধরেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই তার শ্রোতাদের প্রতি।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর বলেছেন :

> "বাংলাদেশের সংস্কৃতির নক্সা তার সমাজকাঠামোর উপহার। ...বাংলাদেশের সংস্কৃতির তিনটি বৈশিষ্ট্য তার মনোজগতের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য তার ভূগোল ও ইতিহাসের প্রতিবেশ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার উৎপাদনপদ্ধতির নিশ্চলতা। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তার লোকজ উপাদানগুলোর সমান্তরাল অবস্থান। ...সমাজকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে সংস্কৃতির নানা বুনোন রচনা করে ধর্ম দর্শন মতবাদের যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছে তার মূল সুর শেষ অবধি এক।...সাংস্কৃতিক ঐক্য অবশ্য উৎপাদনপদ্ধতির নিশ্চলতার উপহার। বাঙালী সংস্কৃতির আদিম-বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান পরম্পরায় মানসিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, এ সত্য, কিন্তু সে পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে, এবং সে গণ্ডী নির্ভর করছে ঐ উৎপাদনপদ্ধতির নিশ্চলতার উপরেই।

প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গ্রামের মেলা লোকজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। বছরে প্রায় 200 মেলা বসে। হয় মুসলিম, অথবা হিন্দু, অথবা বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে এগুলি জড়িত। পদ্মা নদীরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নদীকূলে বর্ধিত প্রাচীন উপনিবেশগুলির কথা স্মরণ করে হিন্দুরা নদীপূজা করে, পদ্মাপারে নদীমেলা বসায়। আর মুসলমানরা নদীকে জড়িয়ে নেয় তাদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও হাসিকান্নার সঙ্গে, তার প্রকাশ তাদের সারি আর ভাটিয়ালি গানে।

মেলার একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে। এখানে নানা ধরণের পণ্যের বাজার বসে। সেইসঙ্গে এটা একটা উৎসবের উপলক্ষও বটে,—নাচ, গান ও নানা আমোদ-প্রমোদের সমাবেশে, কঠিন পরিশ্রম ও বহু বঞ্চনার জীবনে স্বস্তি ও আনন্দের ছোঁয়া আনে। গ্রাম্য কবি ও বাউলের রচনার মধ্যে লোকগীতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আজও বেড়ে উঠছে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা রূপকল্প খুঁজে পায়। বিভিন্ন শ্রমের ছন্দ থেকে তারা গানের সুর বের করে আনে। তাদের গীতিকাব্যের সঙ্গে যুক্ত আছে অতিপ্রাকৃতবাদ, সেখানে বাসনাকামনার আকুলতার সঙ্গে এসে মিশেছে আধ্যাত্মিক ঔদাসীন্য। এই লোকগীতির সুর ও কথা পশ্চিমবঙ্গেও পাওয়া যায়, যদিও শহরের প্রভাবের ফলে কিছুটা কৃত্রিম ও অলঙ্কারবহুল। বাংলাদেশের লোকগীতির প্রাণখোলা মেজাজ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা শহর অঞ্চলেও কলুষিত হয়নি।

বাউল ও মারফতির গান এর মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট। বাউল এক ধর্মীয়

ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক গান। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই এই দলের অন্তর্গত, কিন্তু কোন ধর্মেরই চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানকে এরা স্বীকার করে না। মদন শেখের গানে বাউলদের এই মনোভাব নিখুঁতভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

তোমার পথ ঢেকোছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই
চলতে না পাই,
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে॥

লালন শা'র নামে সবচেয়ে বড় বাউল মেলা বসে কুষ্টিয়ার শিউড়িয়াতে আর যশোরের হরিহরপুরে। যুবক রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান লালনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ও এই সাক্ষাৎকার কবির মনে গভীর দাগ কেটেছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাউল মেলা বসে ঢাকার কাছে ডেমরাতে।

দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরব বণিক ও পারসিকগণ—বাংলাদেশে সুফীবাদের প্রচলন করেন। উপজাতি ও বৌদ্ধদের মধ্যে তার খুব সমাদর হয়। সুফী পীরদের বাৎসরিক 'উরুস্' পালন উপলক্ষে মেলা বসে, যেমন, ফরিদপুরের অন্তর্গত সুরেশ্বরে, অথবা ঢাকার কাছে সরাইল ফকীরের মেলা। এই উপলক্ষে মারফতি ও মুর্শিদি গান গাওয়া হয়। মুর্শিদির অর্থ 'পথ-নির্দেশক', আর মারফতির অর্থ 'উদ্-ঘাটন'। মাঝে মাঝে বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখসহ, সুফী কাহিনী সমৃদ্ধ এই গানগুলি প্রধানতঃ মুসলমান বাউলদের কণ্ঠে শোনা যায়।

উভয় বাংলাতেই সাধারণ আর একটি লোকগাথা—বৈষ্ণবদের কীর্তন। জারিগান পারসিক ঐতিহ্যের শোকমূলক গান। বাংলাদেশে বিয়োগান্তের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণের মিশ্রণ ঘটেছে। জারিগান সাধারণতঃ কারবালা বিয়োগগাথার কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। মাঝিদের অত্যন্ত প্রিয় গান। ময়মনসিং-এ এ গান গায়করা দল বেঁধে গায়। প্রায়ই তার সঙ্গে নাচও থাকে।

পুঁথিগান একটা রূপকথার পৃথিবীকে জীবন্ত করে তোলে। এ একধরণের পল্লীগীতি যাতে আরবী ও ফার্সী লোককাহিনীর বর্ণনা থাকে, ও দলবেঁধে গাওয়া হয়। পালাগানকে সম্ভবতঃ বলা যায় পুঁথিগানের একটা নিজস্ব বাংলাদেশী সংস্করণ। মধ্যযুগের বাংলাকে বর্ণনা করে এর বিষয়বস্তু হল বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনী। সবচেয়ে বিখ্যাত "ময়মনসিং গীতিকা", যা দীনেশচন্দ্র সেন 1923 সালে সর্বপ্রথম শহরের সাধারণ পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরেন।

কবিগান আর একটি লোকগাথা, যার ঐতিহ্য বাংলাদেশে এখনও অম্লান। এ ক্ষেত্রে কবিতার প্রশ্নোত্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ও ত্বরিত সরস জবাবের ক্ষমতার প্রয়োজন। তাছাড়া, সমসাময়িক ঘটনার সামাজিক সমালোচনার অবকাশও এতে প্রচুর। নদীর মানুষের গান ভাটিয়ালী। এর দীর্ঘ, করুণ তান, দূরত্ব, একাকীত্ব ও বিস্তীর্ণতার অনুভূতি জাগায়। সারিও মাঝির গান। জলের মধ্যে দাঁড় টানার ছন্দের সঙ্গে এ গানের মিল। রংপুরের বৈশিষ্ট্য ভাওয়াইয়া, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গান। এ ছাড়াও অন্যান্য আঞ্চলিক লোকগীতি আছে যেমন উত্তর বাংলাদেশের গম্ভীরা ও গাজীর গান।

1947 সালোত্তর যুগে, শহর এলাকায় যে নতুন সাহিত্যের ধারা দেখা দিল, তা প্রথমে ছিল গ্রামজীবন সংক্রান্ত। প্রায় যেন লোক-ঐতিহ্যেরই শাখাপ্রশাখা। ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে মনোভাব কিছুটা উদার। এমনকি মাঝে মাঝে ধর্মের গোঁড়ামির ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনাও পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় আমলাতন্ত্র, জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনা। মনে পড়ে যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখার কথা।

1952 সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে যুবহত্যা এক নতুন পরিচ্ছেদের সূচনা করে। হুমায়ুন আজাদ অত্যন্ত সঠিকভাবে এই ঘটনাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি দিক্‌চিহ্ন বলে অভিহিত করেছেন। বাঙালী হিসেবে আত্মপরিচয়কে, অন্ততঃ সেই সময়টুকুর জন্যে, অভিজাত সম্প্রদায়ের আরবী ঐতিহ্য ও বাঙালীর জনপ্রিয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের মধ্যে যে-সংঘাত বাঙালী মুসলমানকে যুগ যুগ ধরে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে, তার অবসান ঘটে। এর সত্যতার উদাহরণ পাওয়া যায় আল মাহ্‌মুদের কবিতা 'ঘুমন্ত মায়ের গান'এ, যখন মাতৃভূমির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের প্রতীকের ব্যবহার করছেন।

1947 সাল থেকে সাহিত্যের সবচেয়ে সফল ক্ষেত্র ছোটগল্প ও কবিতা, আগেই বলা হয়েছে। বহু সমাজসচেতন, সংবেদনশীল লেখক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, ও নিজস্ব আবেগ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের পটভূমিতে বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার বিভিন্ন দিকের উদ্ঘাটন করেছেন। অসাধারণ ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে দুজন হলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ ও সৈয়দ শামসুল হক। শওকত আলী আরও আগের প্রজন্মের। তাঁর লেখনভঙ্গী খুব আধুনিক না মনে হলেও, এক ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীর কাছে তাঁর আবেদন পৌঁছয়। হাসান হাফিজুর রহমান ও বোরহান-উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর আরও বহুমুখী প্রতিভার ছোটগল্পের কারিগর।

বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রপত্রিকা বিশিষ্ট লেখকগোষ্ঠীদের মুখপত্র হয়েছে। বাংলাদেশে সাহিত্য আন্দোলনে 'সমকাল' এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিলেন সিকন্দর আবু জাফর, শওকত ওসমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ও শামসুর রহমান। মহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত 'উত্তরায়ণ'এ লেখকদের মধ্যে ছিলেন হুমায়ুন চৌধুরী, জ্যোতিপ্রসাদ দত্ত, সেবাব্রত চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও আবদুল মান্নান সৈয়দ। এই লেখকেরা সকলেই ঢাকা শহরের মানুষ। শুধু আজিজুল হক, যিনি তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্নদের একজন, রাজধানী শহর থেকে সর্বদা দূরে থেকেছেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে 'পূর্বমেঘ' নামে আর একটি সাহিত্য পত্রিকা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নুরুল ইসলামের মত লেখক ও পণ্ডিতদের আকর্ষণ করেছিল।

আয়ুবশাহীর আমলে একটা ভিন্ন ধরণের ইসলামী সংস্কৃতি নানা সরকারী সংস্থার মাধ্যমে চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মতবাদের অনুকূলে একটা সচেতন প্রতিক্রিয়া জেগে উঠেছিল। এক্ষেত্রে 'লেখক শিবির'-এর ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মনিরপেক্ষতা ও হিন্দুমুসলিম চেতনার মিলনের এই নতুন অবগতি হায়াৎ মামুদের অপূর্ব ছোটগল্প 'অবিনাশের মৃত্যু'-তে মহীয়ান রূপে প্রকাশিত হল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুমুসলমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চিত্রণ সংযমে অতুলনীয়। অপর এক অসাধারণ ঔপন্যাসিক ও আধুনিক ঢং-এর ছোটগল্পের লেখক ছিলেন স্বর্গতঃ সৈয়দ ওয়ালিউল্লা, যিনি তাঁর 'লাল শালু'তে নির্মমভাবে ধর্মের ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের মুখোস খুলেছেন।

প্রতিবাদ ও মতবিরোধের সাহিত্য অপ্রত্যক্ষ আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করল—রূপক, ব্যঙ্গরচনা, আজব ছড়া, ও প্রতীকীবাদ। মধ্যযুগের কৃষকবিদ্রোহকে প্রতিপাদ্য বিষয় ক'রে সত্যেন সেন তাঁর 'বিদ্রোহী কৈবর্ত্ত' উপন্যাসে বর্তমান সমস্যাকে তলিয়ে দেখার জন্যে ইতিহাসকে নতুন করে ঢেলে সেজেছেন। শামসুর রহমান একটি ভগ্নগৃহের উদ্দেশে শোকগাথা লিখেছেন! টেলিম্যাকাসের উপরে এক দীর্ঘ কবিতায় তিনি নায়ককে বর্ণনা করছেন বিদেশী অধ্যুষিত এক দেশের নাগরিক বলে। আসল অর্থ কর্তৃপক্ষ ধরে ফেলার আগে শওকত ওসমান তাঁর রূপক কাহিনী 'ক্রীতদাসের হাসি'র জন্যে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছিলেন। 'সংশপ্তক' ও 'সারেং বৌ'র মত উপন্যাসে শহীদুল্লা কওসর গ্রামীণ বাংলাদেশের সুষমা ও বেদনাকে মূর্ত করেছেন।

কবিদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য শামসুর রহমান। শব্দচয়নের সৌষ্ঠব ও রূপকল্পের সূক্ষ্ম ব্যবহারে তিনি এক অদ্বিতীয় শিল্পী। ললিত অনুরাগ ও প্রেমের গীতধর্মী প্রকাশ থেকে, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ ও প্রতিঘাতের বজ্রনির্ঘোষে তিনি স্বচ্ছন্দবিহার করেছেন। তাঁর প্রজন্মের অন্যান্য কবি আলাউদ্দীন আল আজাদ ও হাসান হাফিজুর রহমান সম্পর্কে বলা যায়, তাঁরা প্রতীকধর্মী। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরও এ বয়ঃসীমার মধ্যে পড়েন। আসরাফ সিদ্দিকী এক শক্তিশালী ব্যঙ্গরসিক রচয়িতা। লেখিকাদের মধ্যে সুফিয়া কামাল ও মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা তাঁদের গীতিকাব্যধর্মী রচনার জন্যে সুখ্যাত। সৈয়দ আলী আহ্‌সান গভীর ধর্মিষ্ঠ অভিব্যক্তি থেকে রবীন্দ্রনাথের শব্দতরঙ্গের ব্যাপক নিগূঢ়বাদে গমন করেছেন। জসীমউদ্দীনের পূর্বতন চারণভূমির ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন রওশন ইয়াজদানী ও আবদুল হাই মাশরিকি। তরুণ সমাজদ্রোহী দাউদ হায়দার আবেগতপ্ত প্রেমের কবিতা, আকুল দেশপ্রেম ও অন্ধ দেশাচারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ক্রোধ—সর্বক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দে বিচরণরত। অন্যান্য জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আহমেদ মীর, জিয়া হায়দার, হুমায়ুন কাদের, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, আবদুল কাদির ও মহম্মদ মনিরুজ্জামান।

বাংলাদেশের লেখক সম্প্রদায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দিগন্তকে বিস্তৃত করেছেন তাদের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি ও ব্যাপ্তির সঞ্চার ক'রে। মনে হয় যেন সত্যিই বাংলাদেশ ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লার স্বপ্নকে সফল করেছে :

> যেদিন বাংলার হিন্দুসাহিত্য ও বাংলার মুসলিম সাহিত্য গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মিলিত হয়ে উভয়ের হৃদয়ের মিলন সম্পাদন করবে, সেইদিনই বাংলা সাহিত্য পূর্ণ হবে।
>
> (—নেত্রকোনার মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণ, ১৩৩৬)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থেকেই, এবং পরে বাংলা আকাদমী, ধর্মনিরপেক্ষ উদারপন্থী শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র ছিল। খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতীগণ, যথা ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা, আবুল ফজল, ডঃ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন ও অন্যান্যরা তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একটা সমগ্র প্রজন্মকে উদার, বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কাজী আব্দুল ওদুদ ও আবুল হোসেন ধর্মভাবনা ও ধর্মের পুনর্মূল্যায়নের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আবদুল গণি হাজারী পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ, তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞানপিপাসু এক বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও এক বিশিষ্ট কবি ছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের উদ্দেশ্যে এক সংস্থা স্থাপনের প্রচণ্ড দাবীর

ফলে বাংলা আকাদমীর জন্ম 1964 সালে। এই সংস্থা, ঢাকা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধজনের গবেষণামূলক গ্রন্থের প্রকাশনাভার গ্রহণ করে। এঁদের মধ্যে অবশ্যই পড়েন বাংলাভাষার বিভিন্ন শাখার গবেষণার পিতৃপ্রতিম ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা।

স্বাধীনতার তাৎক্ষণিক পরবর্তী যুগে বহু সংবেদনশীল ছোট গল্প ও উপন্যাসের লেখকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জেনারেল ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর নয়মাস-ব্যাপী অকথ্য অত্যাচারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। তাদের বেদনাপ্লুত আবেগ ও ক্রোধের মর্মগ্রাহী দলিল এগুলি। শওকত ওসমান-এর 'নেকড়ে অরণ্য' ও আনোয়ার পাশার 'রাইফেল, রোটি ঔর ঔরৎ' এই শ্রেণীর লেখার মধ্যে অসামান্য। ওসমান ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শী বটে, সেইসঙ্গে আছে দরদী মনের স্পর্শ। তাঁর এই উপন্যাসে বন্দীশিবিরে এক উন্মত্ত সৈন্যবাহিনীর লালসার শিকার, সমাজের বিভিন্ন স্তরের একদল মেয়ের বেদনা, যন্ত্রণা, লজ্জা ও মর্যাদাবোধকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। বন্দিনীদের পরস্পরের মধ্যে পরিস্ফুটমান সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণনামূলক কয়েকটি কথা, এবং তাদের মানসিকতার ক্রমপরিবর্তন, চরিত্রগুলিকে একেবারে জীবন্ত করে তোলে। একটা কঠোর সংযমের কাঠামোর মধ্যে ভাবোদ্দীপক ভাষা এক অসহ্য অভিজ্ঞতায় পাঠকের অংশগ্রহণকে আরও তীব্র করে। অন্যদিকে আনোয়ার পাশা আমাদের এক মর্মস্পর্শী প্রামাণিক বিবরণ দেন। তাঁর সহজ বর্ণনার ভঙ্গী অতর্কিত সামরিক আক্রমণের প্রথম কয়েকদিনের সুস্পষ্ট ছবি চোখের সামনে তুলে ধরে।

অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিদের মধ্যে, বিশেষ করে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল, একটা অস্থিরতার অনুভূতি, হতাশা ও মোহভঙ্গ এসেছে, এবং তা ক্রমবর্ধমান।

অন্যান্য শিল্পদ্যোতনার আঙ্গিকের মধ্যেও বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন দেখা যায়। ধরা যাক স্থপতিবিদ্যার কথা। প্রাচীনতম স্থাপত্যধারা সঞ্জাত স্থাপত্য শৈলীর বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথির নির্দেশ অনুগামী পাহাড়পুরের মন্দির এক অপূর্ব নিদর্শন। বাংলাদেশের পোড়ামাটি শিল্পের আরম্ভ খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার খ্যাতি অম্লান ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত রাজশাহীর কয়েকটি মসজিদে, যেমন জামা মসজিদের গায়ে পোড়া মাটির উপরে বিমূর্ত নক্সা ও কারুকার্য খোদাইকরা অপূর্ব সুন্দর চতুষ্কোণ কিনারা

আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কান্তানগর মন্দির অতি উচ্চশ্রেণীর পোড়া মাটির শিল্পকলার অপর এক নিদর্শন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাঠান আক্রমণ বাংলাদেশে সারাসিনীয় শিল্পপদ্ধতির প্রভাব নিয়ে এসেছিল। তার ফলে স্থানীয় ঐতিহ্যে যেমন কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্টো নৌকার নমুনা গৃহীত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম মানুষ বা জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতির বিরুদ্ধে। তার জায়গা নিয়েছে নিসর্গশোভা থেকে নেওয়া স্থানীয় নক্সার বিমূর্ত অনুকৃতি। বাংলাদেশে স্থাপত্যে তখন জ্যামিতিক নক্সা ও হস্তলিপি শিল্প প্রধান অলংকরণের উপকরণ। পারসিক প্রভাবে এল ইঁট সাজিয়ে নক্সা ও চিত্রিত টালি। প্রথমটি ব্যবহৃত হত শূন্য দেওয়ালের একঘেঁয়েমি ভাঙার জন্য; বাগেরহাটের রণবিজয়পুর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাগেরহাটে খান জাহান আলীর কবর এবং ঢাকার লালবাগ কেল্লায় পরীবিবির কবরের শূন্য দেয়ালের শোভাবর্ধন করছে জেল্লা ধরানো টালি। ভারত-সারাসিনীয় স্থাপত্যের অপর বৈশিষ্ট্য ধনুকাকৃতি খিলান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এইধরণের খিলানের উৎকৃষ্টতম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় ঢাকার বাবা আদম মসজিদে, বাগেরহাটের সাত গম্বুজ মসজিদে ও যশোরের শৈলকূপা মসজিদে।

কয়েকটি অলংকরণের বিষয়বস্তুতে সুফীবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। বৃত্ত, অর্ধ-বৃত্ত, গোলাপ, পাথরে সূক্ষ্ম জালি কাজ—এ সবেরই প্রতীকী অর্থ আছে। গোলাপের আনুমানিক অর্থ—ধ্যানের আত্মিক পথ। লোক-ঐতিহ্যের পৃথিবী ও বীজের প্রতীকের সঙ্গে এর মিল অতি ঘনিষ্ঠ।

আধুনিক স্থপতিরা, যেমন মাজহারুল ইসলাম, মাঝে মাঝে, প্রাচীন আঙ্গিকের সঙ্গে জ্যামিতিক ও বিমূর্ত ভাবের মিশ্রণ অনেক ক্ষেত্রেই পশ্চিমের প্রভাব অনুযায়ী আনতে চেষ্টা করেছেন। প্রসিদ্ধ বিদেশী স্থপতি কাহন, অপরপক্ষে, আয়ুব প্রতিশ্রুত ঢাকার নতুন রাজধানীর পরিকল্পনায় ভারত-সারাসিনীয় খিলানকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। শহরের বাসগৃহ ও বিশেষ করে বাণিজ্যিক আবাসগুলিতে পাশ্চাত্য নির্মাণ-ধাঁচের প্রাধান্য ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে।

ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামির দরুণ ব্যাহত একটি শিল্প-ঐতিহ্য হল খোদাই করা মূর্তি। অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে সেন ও পালরাজাদের সময়ে, বাংলায় একটি অতিসমৃদ্ধ ভাস্কর্যশিল্প ঘরানা গড়ে উঠেছিল। এখনও বাংলাদেশে ভাস্কর্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, কলাকৌশলের শ্রেষ্ঠতায়, মাধুর্যে, সৌষ্ঠবে এবং তীক্ষ্ণ ও সুনির্দিষ্ট রূপরেখায় তা অনবদ্য। বাংলাদেশে প্রধান ভাস্কর্যকেন্দ্র ছিল রাজশাহী, দিনাজপুর,

বগুড়া, ঢাকা এবং শ্রীহট্ট। এখন আবার ভাস্কর্যের এই ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রবর্তনের কিছুটা চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বভাবতঃই জোর পড়ছে আধুনিক আঙ্গিক ও শৈলীর উপরে।

ইতিমধ্যেই নানাবিধ শৈলীর বিকাশ দেখা যাচ্ছে, যথা জ্যামিতিক, ধাতুর 'কোলাজ', ঢালাই ধাতু ও ছাঁচে ঢালা ধাতু। কিছু তরুণবয়স্ক ভাস্কর বিভিন্ন উপাদান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এই শিল্পক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তক নোভেরা আহমেদ। ইনি শ্বেতপাথরে জ্যামিতিক কাজ করেছেন। তাঁর প্রথম প্রদর্শনী হয় ষাটের দশকে। ওঁর অনুসারী মতিউর রহমান ও আনোয়ার জাহান। আবদুর রাজ্জাক, শামসুল ইসলাম নিজামী ও মহম্মদুল হক, ঢালাই ধাতুর প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। হামিদুজ্জামান কাজ করছেন ছাঁচে ঢালা ধাতু নিয়ে। চন্দ্রশেখর দে ও মনসুর-উল-করিম জ্যামিতিক আকৃতির ব্যবহারে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। নীতিন কুণ্ডু, জাকিয়া বেগম ও তপন কুমার দাশ তাঁদের প্লাস্টার-কাস্টের জন্য সুপরিচিত। আনোয়ারুল হক, আবদুস সত্তর ও আবদুল রওফ সরকার আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর হিসাবে পরিগণিত।

কারিগরী শিল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য লোক ঐতিহ্য এখনও সদর্পে বিরাজ করছে। পুরোন, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরী নক্সী কাঁথার শিল্প পশ্চিমবঙ্গে বিস্মৃত, বাংলাদেশের গ্রামে এখনও তৈরী হয়। সূচীশিল্পে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে মেয়েদের পারদর্শিতার এ এক অপূর্ব উদাহরণ। একটা ভাল নক্সী কাঁথা তৈরী করতে অসম্ভব ধৈর্যের প্রয়োজন, মাসের পর মাস লেগে যায় শেষ করতে। জ্যামিতিক নক্সা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাখী, জীবজন্তু, ফুল, এমনকি কাহিনীও উজ্জ্বল নানা বর্ণে সারা কাঁথা জুড়ে সেলাই করা হয়। প্রাচীন নক্সাগুলি আজকাল আর বিশেষ দেখা যায় না, তার জায়গায় সেইরকমই মনোহর আধুনিক ছুঁচের কাজ এসেছে। প্রাচীন নক্সী কাঁথার কিছু অপরূপ নিদর্শন ঢাকা মুজিয়ামে রক্ষিত আছে, অথবা তোলা আছে পারিবারিক অতীত চিহ্ন হিসাবে। মিহি বুনুনির শরের তৈরী পাটির মনোহারিত্ব একই শ্রেণীর।

পটের কাহিনী এককালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা করত, সম্প্রতি তাকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সমকালীন পটের বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ, এমনকি পরিবার পরিকল্পনাও। শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন সাইকেল রিকশর মালিক-চালকের মাধ্যমে এই সমৃদ্ধ লোক-ঐতিহ্য নাগরিক জীবনে প্রবেশ করেছে। এই বাহনের প্রত্যেকটি খালি জায়গায় কড়া রঙে আঁকা ফুল, নারীমূর্তি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবজন্তু ও পাখী আঁকা আছে। প্রাচীন লোক-অঙ্কনের সৌন্দর্য ও শিল্পের ভারসাম্য এখানে নেই বটে, তবু তারা যে একই

সংস্কৃতির শাখাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুক্তির অব্যবহিত পরে জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধের দৃশ্য ও পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্মম অত্যাচার।

চারুকলার অন্যান্য লোকজ শিল্পের মধ্যে পড়ে মুখোস, যাত্রায় যা নাচিয়েরা পরে, ও রাজশাহীতে 'গম্ভীরা' গীতবাদ্য উৎসবে ব্যবহার হয়। মাটির সরায় ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক কারুকার্য করা হয়, হিন্দু দেবতাদেরও ছবি আঁকা হয়, বিশেষ করে লক্ষ্মীর।

বাংলা বিভাগের অব্যবহিত পরেই নাগরিক শিল্পীরা একটা সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সমস্যা জাতীয় পরিচিতির সমস্যারই অঙ্গ। বাংলার পূর্ব অংশে কোন দেশজ শিল্প-ঘরানা গড়ে ওঠেনি। বেশীর ভাগ শিল্পীরই শিক্ষা কলকাতায়, পূর্ব বাংলার লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। পারসিক উত্তরাধিকার সম্পর্কেও তাদের অন্তরঙ্গতার দাবী করার উপায় ছিল না। পাকিস্তানের একটা রুদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার সঙ্কল্পের দরুণ, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ বন্ধ ছিল, বহির্জগতের সঙ্গে আদান প্রদানেরও সুযোগ ছিল না। তাই একেবারে গোড়া থেকে নতুন এক জাতীয় ঐতিহ্যের সূচনা করতে হল।

এই দায়িত্ব পালনেই প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা আত্মনিয়োগ করলেন। জয়নাল আবেদিন ছিলেন তাঁদের পথিকৃৎ। বাংলা বিভাগের পরে তিনি ঢাকায় আসেন। তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন 1943 সালে বাংলা দুর্ভিক্ষের উপরে রেখাঙ্কন করে। কলকাতায় ইতিমধ্যেই তিনি বহুমুখী ও সংবেদনশীল শিল্পী পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত। পরিমিত রেখা ও দৃপ্ত, তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি এঁর বিশেষত্ব। জয়নাল ছিলেন এক মহীয়ান মানবতাবাদী। তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সব উপাদানই ছিল। তাঁর দেশবাসী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, তাদের আনন্দ বেদনার ভাণ্ডার থেকে তিনি অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করতেন, প্রকৃতির সঙ্গে তিনি ছিলেন একাত্ম। তিনি বলতেন নদী তাঁর পরম গুরু। তাঁর এই চিন্তার মধ্যে তিনি বাংলাদেশের আত্মাকে মূর্ত করেছিলেন। জয়নাল যে এমন একটা আধুনিক অঙ্কনরীতি বের করে আনবেন যা একই সঙ্গে জাতীয় ও জনজীবনের সংস্কৃতিতে নিহিত, এটা অবধারিত। তাঁর প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন যামিনী রায় ও লোক-ঐতিহ্য। অনুকরণ বা পুনঃপ্রবর্তন না করে তিনি সাফল্যের সঙ্গে আধুনিক বিমূর্তবাদ ও স্থানীয় লোক-শিল্পকে মিশ্রিত করেছিলেন। এই অঙ্কনশৈলী ছিল বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। নিপুণ হাতে তিনি বাস্তবতার সঙ্গে অবাধ কল্পনাকে একত্রিত করেছিলেন। তার ফলে তাঁর শিল্পকর্মে এসেছে গীতিকাব্যের লালিত্য, অথচ রেখার সবলতা ব্যাহত হয়নি, বা তাঁর

অনুচ্চ ও কখনওবা অনুজ্জ্বল রঙের শোভা দ্রষ্টার চমৎকৃতিকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেনি। দেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর আপোষহীন দায়বদ্ধতা তাঁকে কিছু শ্রেষ্ঠ কাজের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বিদেশী শাসনের চাপে তাঁর প্রাণপ্রতিম সোনার বাংলার ক্রমিক হৃতশ্রী বর্ণনা করে একটি কুড়ি মিটার দীর্ঘ মোড়ানো পট তৈরী করেন 1970 সালে। 1970 সালের প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার ধ্বংসলীলা একটি নয় মিটার দীর্ঘ পটে—মানপুরা 70—স্থান পায়। তাঁর হৃদয় ছিল অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে বাঁধা, তাই নয় মাসের পাকিস্তানী সামরিক অত্যাচারের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোনদিন সত্যিকারের উদ্ধার পাননি। সে-অভিজ্ঞতা তাঁর মনটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

জয়নাল আবেদিনই বাংলাদেশে শিল্পশিক্ষার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। 1948 সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার কলেজ অফ আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটসের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ।

বাংলাদেশী শিল্প শিক্ষায়তন সৃষ্টির কাজে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও সহকর্মী কামরুল হাসান, গোড়ার প্রজন্মের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ আর্টস-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত, কামরুলের বহুধা অঙ্কনরীতিতে কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অঙ্কনপ্রাচুর্যে। জলরঙে তিনি অপূর্ব নিসর্গ দৃশ্য আঁকেন। বলিষ্ঠ প্রাচীরপত্র ও সূক্ষ্ম কাঠ-খোদাই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমান নিপুণ, ও স্থানীয় পটের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বিমূর্তবাদকে সাফল্যের সঙ্গে মেলাতে পারেন। অতি উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে তাঁর প্রখর অনুভূতি, বাঙময় রেখাঙ্কণে তিনি সিদ্ধহস্ত।

জীবনস্পন্দনে ভরপুর এক নতুন শিল্পচিন্তা বাংলাদেশে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সমকালীন পৃথিবীর শিল্পধারার সঙ্গে বহুলাংশে এর মিল আছে, কিন্তু লোক ঐতিহ্যের মূল এখনও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি।

খ্যাতিমান শিল্পীদের অনেকেই প্রধানতঃ বাস্তবধর্মী অঙ্কনপদ্ধতি অনুসরণ করেন, যথা আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, এস, এম, সুলতান ও সমরজিৎ রায়চৌধুরী।

বহু তরুণ শিল্পী জ্যামিতিক রেখাবৈচিত্র্য পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবতঃ হাসেম খান, আবু তাহের এবং হাসি চক্রবর্তী। আবদুল বাসিত, শাতব, ও সৈয়দ শফীকুল হোসেনও যথেষ্ট সুপরিচিত। আবদুর রাজ্জাক একজন সংবেদনশীল অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকর ও ভাস্কর একাধারে। কায়ুম চৌধুরী ও শহীদ কবীর সমকালীন পটভূমিতে লোকজ শিল্পের বিমূর্তবাদ প্রকাশ করেন।

রাজনৈতিক উদ্বেলন এক শক্তিশালী প্রাচীরপত্র-শিল্পের জন্ম দিয়েছে, জোরালো রং ও বাংলা অক্ষরের কারুশিল্পসুলভ ব্যবহারে যা অতি সফল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কয়েকজন তরুণ শিল্পী, যথা, আনিমুল ইসলাম ও স্বপন চৌধুরী, এই মহান সংগ্রামের নিদারুণ যন্ত্রণা ও বীরত্বের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন, ও 1971 সালের নয় মাসের যে সন্ত্রাস রাজত্বের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে কাটাতে হয়েছিল, তার ত্রাস ও আতঙ্কের জাজ্বল্যমান ও শক্তিশালী ছবি এঁকেছেন। শামসুল আলম নিজামী চাকমাদের জীবনকে চিত্রিত করেছেন বিমূর্ত শৈলীতে। সাধারণভাবে চলিত প্রথা থেকে একেবারে ভিন্ন পথে গেছেন আবদুস সত্তর। তাঁর দেশে সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র উপমহাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক।

দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী, যাঁরা পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় ছাত্র ছিলেন, মহম্মদ কিব্রিয়া তাঁদের নেতা হিসাবে পরিগণিত। আর সত্তরের দশকের অতি তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পী সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর দে।

নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে, ইসলামী গোঁড়ামি একটা প্রাচীন নৃত্য-ঐতিহ্য বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমের আধুনিক নৃত্যের ধরণের সঙ্গে পরিচয়েরও কোন সুযোগ হয়নি। এমনকি এখনও লোক-ঐতিহ্যই অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। ধর্মীয় অথবা বিভিন্ন ঋতুতে অনুষ্ঠিত মেলার সঙ্গে যুক্ত উপজাতি আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এগুলি জড়িত। চাকমাদের আছে বিশু সংক্রান্তি নাচ। বাংলাদেশের মণিপুরীদের 'লাই হারা উবা' এক জনপ্রিয় নাচ। খাম্বা ও থোইবি, যাদের শিব ও পার্বতীর প্রতিরূপ ধরা হয়, তাদের অমর প্রেমকাহিনীর উপরে এই নাচ বিধৃত। 'ওয়াংগালা' নাচ গারোদের ফসল কাটার উৎসবের অঙ্গ, এবং 'পিসা ডিমা ডিমা'ও। শেষোক্ত নাচে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে।

সাঁওতালদের বসন্ত উৎসবের নাচ 'সরহুল'। এতে ঢাক, বাঁশী ও কাঁসর বাজায় ছেলেরা, সেই সুরে শুধু মেয়েরা নাচে। 'বাহা' অবশ্য সাঁওতাল পুরুষের বসন্ত নৃত্য। এই উপলক্ষে মেয়েরা সুন্দর সাজপোষাক করে। তিপরা, মগ ও সাঁওতালরা সবাই মাথায় কলসী নিয়েও নাচে। এই নাচকে বলে কলসী নাচ বা ঘট নাচ। তিপরাদের মধ্যে এই নাচ বিবাহের সঙ্গে যুক্ত, বর এবং কনেকেও মাথায় বোতল নিয়ে নাচতে হয়।

ষাট সালে পাশ্চাত্য জগতের প্রিয় 'টুইস্ট' নাচের সঙ্গে মগদের 'পংকুং' নাচের অনেকটা মিল আছে। সচরাচর বিয়ের সময়ই এই নাচ হয়, তবে শুধু কুমারী

মেয়েদেরই অধিকার আছে এই নাচ নাচবার। লুশাইদের প্রিয় নাচ 'চেরিলাম' বা বাঁশ নাচ, ও 'পরলম' বা ফুলনাচ দিয়ে বসন্তকে আহ্বান করা হয়। তরুণ ও তরুণীরা উভয়েই এই নাচে অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য লোকনৃত্য সাধারণতঃ কোন না কোন লোকগীতির সঙ্গে জড়িত, যেমন জারি নাচ, কীর্তন নাচ, সারি নাচ এবং ফকীর নাচ। এসবই পুরুষের নাচ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উপরে বিধৃত 'ঘোটু' নাচে ছোট ছেলেরা অংশ নেয়। কোন কোন এলাকায় ফসল কাটার সময় গোষ্ঠীনৃত্য হয়।

নাগরিক নৃত্যের যে ধারাটি বিকশিত হয়েছে, তার ভিত্তি কিছুটা মার্জিত লোকনৃত্য, যথা মণিপুরী নৃত্যের উপরে, সঙ্গে ধ্রুপদী নৃত্যরীতি ও শান্তিনিকেতনের প্রভাব। জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত লোকগাথা 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' অবলম্বনে নৃত্যনাট্য অতি জনপ্রিয় নৃত্যনাট্যগুলির অন্যতম। সাম্প্রতিক কালে এইধরণের নৃত্যনাট্যের মাধ্যমেও মুক্তিসংগ্রামের কথা বলার চেষ্টা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়ন করার উদ্দেশ্যে সরকারপ্রদত্ত পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ নিয়ে শহরে নৃত্যকলার পত্তন হয় প্রতিবাদ-আন্দোলনের অংশ হিসাবে। 'বুলবুল একাডেমী' ও 'ছায়ানট' এই দুটি প্রধান সংস্থা বাংলাদেশে একটা নাগরিক নৃত্যধারা সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। 'ছায়ানট'-এর প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহিদুল হক ও কাজী মোতাহার হোসেনের কন্যা সন্জিদা খাতুন। সন্জিদা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। তার সংস্থা রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুরাগী, রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেছে। সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পকলা বাংলাদেশে অজানা নয়, কিন্তু বিকাশের সুযোগ পায়নি। ধ্রুপদী নৃত্যের একমাত্র ধারক কিছুটা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কান্তা জামাল; এঁর বৈশিষ্ট্য কথক নৃত্য।

দেশবিভাগের আগে বাংলাদেশে ধ্রুপদী সঙ্গীতের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত এইধরণের নৃত্যগীতের কোন মর্যাদা ছিল না, কারণ এর পৃষ্ঠপোষক, প্রধানতঃ হিন্দু জমিদাররা, দেশত্যাগ করেছিলেন। পাকিস্তানী ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রভাব একটা লঘু ধ্রুপদী সঙ্গীতের রুচি তৈরী করেছিল, বিশেষ করে গজল ও ঠুংরি। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানীদের সম্পর্কে প্রতিকূলতা তাদের সংস্কৃতি ও শিল্প সম্পর্কেও বিতৃষ্ণা জাগাল। গজল ও ঠুংরি গাওয়াকে জাতীয়তাবিরোধী মনে করা হত। দেশবিভাগের পরে ধ্রুপদী যন্ত্রসঙ্গীত অবহেলিত অবস্থায় ছিল। আলাউদ্দীন খান পরিবারের কিছু সদস্য ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে কোন মতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ফুলঝুরি খান সেতারে অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টি করেন।

ধ্রুপদী সঙ্গীতমার্গের অন্যান্য শিল্পী হলেন গুল মহম্মদ খান ও কানাইলাল শীল। বাংলাদেশের মুক্তির পর ধ্রুপদী সঙ্গীতে আকর্ষণের পুনরভ্যুদয় দেখা যাচ্ছে। জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন গজলে পারদর্শী। আভা আলম অপর এক ধ্রুপদী গায়িকা। কিন্তু নাগরিক নব্যদের মধ্যে 'পপ' সঙ্গীদের সমাদর বেশী।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটা জীবন্ত লোক-ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, আধুনিকতা শহর এলাকায় যৌথ গানের প্রচলন করতে ব্যর্থ হয়েছে। চলচ্চিত্রশিল্পে বেশ কিছু সুদক্ষ সুরকার ও গীতকার থাকা সত্ত্বেও, রেকর্ড করার যন্ত্রশিল্পের অভাবে চলচ্চিত্র সঙ্গীতের প্রভাব কম। পাশ্চাত্য প্রেরণা ও স্থানীয় লোক-ঐতিহ্যের অস্বস্তিকর মিলন সত্ত্বেও, পপ গানের একটা উচ্ছল মাটির টানের আবেদন আছে। এমনকি আধুনিক চলচ্চিত্র-সঙ্গীতও লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। এই ব্যাপারটাই আধুনিক বাংলাদেশী গান ও সুরকে একটা দৃঢ়ভিত্তিক কাঠামো দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে যার প্রায়শঃই অভাব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে রুনা লায়লার নাম উল্লেখ্য, কোকিলকণ্ঠী এই গায়িকা ভারতকে ঝড়ের বেগে জয় করেছিল।

লোকগীতি ও সুর এইভাবে নাট্যজগতে তার প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। যাঁরা বেশী জনপ্রীতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন নিনা হামিদ, আরতি সাহা, রথীন ঘোষ, মুস্তাফা জামাল আব্বাসী ও ফিরদৌসী বেগম। শেষোক্ত দুইজন, বিখ্যাত লোকসঙ্গীতকার আব্বাসউদ্দীনের সন্তান।

অন্যান্য জনপ্রিয় সঙ্গীতের মধ্যে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান। পাকিস্তানের আমলে নজরুলসঙ্গীতের শুধু ইসলামী দিকটির উপরেই জোর দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এমনকি তাঁর কিছু গানের কথার রদবদল করা হয়েছিল, ও বাকী গান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। সর্বপ্রকার নজরুল সঙ্গীতের পুনঃপ্রবর্তন প্রতিরোধ-আন্দোলনের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। রবীন্দ্রসঙ্গীত কিছুকাল রেডিও ও টেলিভিশনে নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে উভয় শ্রেণীর সঙ্গীতই অধিকতর সমাদর পাচ্ছে। নজরুলসঙ্গীত লঘু ধ্রুপদী গানের প্রতি আকর্ষণ আবার সৃষ্টি করছে। ধ্রুপদী ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা ক্রমশঃ বাড়ছে। সুপরিচিত নজরুলসঙ্গীত বিশারদ আঙ্গুরবালা ও ধীরেন মিত্র বাংলাদেশে আমন্ত্রিত হয়েছেন উচ্চাভিলাষী তরুণ-বয়স্কদের প্রশিক্ষণের জন্যে। অবশ্য বাংলাদেশে ফিরোজা বেগমই নজরুলসঙ্গীতের তুলনাহীনা সম্রাজ্ঞী। জনপ্রিয়তায় রবীন্দ্রসঙ্গীতও একই পর্যায়ে পড়ে। সুবিখ্যাত শিক্ষক শৈলজানন্দ

মজুমদার তাঁর পুরাতন মাতৃভূমিতে দীর্ঘকাল কাটিয়ে, দেশের নানা অংশে ছাত্র-গোষ্ঠীদের ও প্রতিষ্ঠিত গায়ক-গায়িকাদের এইসব গান শিখিয়েছেন। লোকসঙ্গীতের সুরাশ্রিত কোন কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাংলাদেশী গায়কগায়িকার কণ্ঠে যে আবেশ ও রসঘনত্ব প্রকাশ পায়, পশ্চিমবঙ্গে, এমনকি শান্তিনিকেতনেও তা বিরল। বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতকারদের মধ্যে আছেন হামিদা আতিক, মাহমুদা বেগম ও সঞ্জীদা খাতুন।

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে 'যাত্রা'র পুনরুদ্ভব হয়েছে বটে, কিন্তু তা কিছুটা নগরগন্ধী। বাংলাদেশে যাত্রার প্রাচীন চরিত্র অক্ষত। যেটা বদলেছে তা হল নারীচরিত্রে পুরুষের বদলে স্ত্রীলোকের অভিনয়। বিষয়বস্তু বেশীরভাগই এখনও পৌরাণিক, ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক। সর্বদা উৎসবে বা মেলায় যাত্রা অভিনীত হয়। যাত্রার দলের লোকেরা অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু তারা যাত্রাসংক্রান্ত সমস্ত হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। বাংলাদেশে 140টির উপরে যাত্রার দল আছে। কিছু পুতুলনাচের দলও আছে যারা এক মেলা থেকে অন্য মেলায় ঘুরে বেড়ায়।

বাংলার মুখ্য শিল্প নাটক। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' পরিবেশনের সঙ্গে আধুনিক নাটক ঢাকায় প্রথম আসে 1873 সালে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ অধিকৃত নীল-চাষের চাষীদের দুর্দশা ও প্রতিরোধের কাহিনী এ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ডায়ামণ্ড জুবিলি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় এবং অন্য কয়েকটি শহরে বেশ কিছু সৌখীন নাট্যামোদী গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এরা কলকাতার প্রচলিত প্রবাহে প্রভাবান্বিত হত। এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীরা।

চলচ্চিত্রের, বিশেষ করে সবাক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব নাট্যশিল্পকে প্রচণ্ড আঘাত হানল, কারণ নাট্য-আন্দোলনের একটা দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল না। তখন চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি। অল্প সময়ের জন্যে 1943 সালের দুর্ভিক্ষকালীন নবজাত গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু দেশবিভাগ বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনকেও কঠিন আঘাত হানল। শাসকপক্ষের দিক থেকে নৃত্যগীত অভিনয়শিল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনীহা, এমনকি বৈরীভাবও ছিল, কারণ তাঁরা মনে করতেন ওটা হিন্দু সংস্কৃতির ছাপমারা নিদর্শন। নাটকের বিকাশে বাধা পড়ার অপর কারণ হল ধনী হিন্দু পৃষ্ঠপোষকদের ভারতে বিদায়গ্রহণ।

কিন্তু নাট্যামোদীরা অত সহজে হাল ছেড়ে দিলেন না। 1947 ও 1951 সালের মধ্যে নিয়মিত কয়েকটি নাটকগোষ্ঠী দাঁড় করাবার বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। তাদের

মধ্যে 'মিনার্ভা থিয়েটার' ও 'ড্রামা সার্কল' অন্ততঃ কিছুকাল টি'কে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। আবার, ভাষা-আন্দোলন নাটকের আন্দোলনকে জোরদার করল। এই সময়ে 'ড্রামা সার্কল'এর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সংগঠন অন্ততঃ বারোটি নাটক মঞ্চস্থ করে, যার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', এবং 'ইডিপাস রেক্স' ও 'আর্মস অ্যাণ্ড দ্য ম্যান'এর বাংলা সংস্করণ। এই নাট্যগোষ্ঠীদের ঘিরে নাটকের কলাকুশলীরা গড়ে উঠতে লাগল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যক্রিয়া-কর্মের আর একটি প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। বহুমুখী প্রতিভাধর ও সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন। বিদেশী নাটকের অনুবর্তন ছাড়াও মৌলিক নাটক লিখে তাদের মঞ্চস্থ করলেন, ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেন। 1952 সালের ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের নিয়ে লেখা তাঁর 'কবর' নাটক রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। নুরুল মোমেন ও আশকর ইবন শেখ নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক এই নবকলেবর নাটকের ঐতিহ্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা একাডেমীও প্রচুর উৎসাহ জুগিয়েছিল।

প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত লেখক পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদ করেছেন। প্রাচীন গ্রীসিয় নাটক থেকে শুরু করে, শেকসপিয়ার এবং অতি আধুনিক নাটক পর্যন্ত—পাশ্চাত্য জগতের প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক অনূদিত হয়েছে, এবং কয়েকটি মঞ্চস্থও হয়েছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যকারদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশী লেখকরা তাঁদের নাটকে কল্পনাজগৎ ও বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সুখ্যাত ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালিউল্লা এডোয়ার্ড অ্যালবির প্রভাবে তাঁর 'তরঙ্গভঙ্গ' লিখেছেন। সয়ীদ আহমেদ লিখেছেন 'কালবেলা' ও 'মাইলপোস্ট'। শওকত ওসমান লিখেছেন বিদ্রূপাত্মক নাটক, 'কাঁকরমনি', 'তস্কর-ও-লস্কর' এবং 'আমলার মামলা'। নুরুল মোমিনের 'নেমিসিস'ও এক অনবদ্য সৃষ্টি। মৌলিক নাটকও লিখেছেন কয়েকজন লেখক, যেমন সেলিম আল্ দীন, মমতাজউদ্দীন আহমেদ, আল মনসুর, জিয়া হায়দার ও আলাউদ্দীন আল আজাদ।

মুক্তিসংগ্রামের সময়ে বহু লেখক যাঁরা কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে পাল্টা প্রচারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের পুনর্বার যোগাযোগ হয়। মুক্তি লাভ করার অব্যবহিত পরেই ঢাকায় নতুন নাট্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব হতে লাগল। সর্বপ্রথম এল

'বহুবচন' 1972 সালে। তারপরে 'নাগরিক'। 'নাগরিকের' গোড়াপত্তন 1969 সালে, এবং পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে 1973 সালে। বর্তমানে ছয়টি নাট্যশাখা ঢাকায় নিয়মিত কাজ করছে—'নাগরিক', 'থিয়েটার', 'ড্রামা সার্কল', 'ঢাকা থিয়েটার, 'বহুবচন' ও 'প্রতিনিধি'। প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তেই একটি করে নাটক মঞ্চস্থ হয়। 1972 ও 1977 সালের মধ্যে অন্ততঃ ছাব্বিশটি নাটকের দল ঢাকায় নাটক পরিবেশন করেছেন। রাজধানী থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে দিনাজপুর, ময়মনসিং ও চট্টগ্রামে। নাট্যোৎসব ও নাট্যপ্রতিযোগিতা নিয়ম করে সংগঠিত হচ্ছে। সর্বপ্রথম নাট্যোৎসব হয় 1976 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। পরবর্তী দুটি উৎসবে প্রত্যেক জিলা শহর থেকে অংশগ্রাহীদের সমাবেশ হয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তির অব্যবহিত পরে, অন্যান্য শিল্পের মত, নাটকেরও লক্ষ্য ছিল একটা দরিদ্র, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পরস্পর-বিরোধিতার শিকার জনগণের প্রত্যাশা, হতাশা, যন্ত্রণা ও নিপীড়নের আর্তিকে ভাষা দেওয়া। কলকাতার বাংলা নাটকের উপরে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন 'নাগরিক'-এর প্রযোজনায় বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'এর মঞ্চায়ন। অ্যালবি এবং ব্রেশট অবলম্বনে নাটকও অভিনীত হয়েছে। কিছু মৌলিক নাটক, যথা 'তৈল সংকট', অনেকটা পোস্টার নাটকের কায়দায় প্রশাসন বিভাগের দুর্নীতি ও ব্যর্থতাকে তীব্র কষাঘাত করেছে।

বাংলাদেশে নাট্যগোষ্ঠীদের প্রচুর অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। নাটকের অপরিহার্য প্রয়োজন একটি ভাল রঙ্গশালা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তাদের আয়ত্তে নেই। যাঁরা নাটক করেন তাঁরা হয় ছাত্র অথবা মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী। আশার লক্ষণ একটাই যে পয়সা খরচ করে নাটক দেখতে অভিলাষী একটা নিয়মিত দর্শক-শ্রেণী গড়ে উঠছে। টেলিভিশন থাকায় সুবিধা হয়েছে। টেলিভিশনে নাটক পরিবেশন দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, ও অতি প্রয়োজনীয় অর্থ সমাগমের পথ খুলে দেয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বয়স অল্প। তবু চলচ্চিত্র শিল্পের পর্যালোচনা না করে সাংস্কৃতিক দৃশ্যপটের কোন সমীক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। দেশ-বিভাগের আগে ঢাকা নবাব পরিবারের খাজা আকমল 1932 সালে "শেষ চুম্বন" প্রযোজনা করেন। দেশবিভাগের পরে, বাংলাদেশ বাংলা ছবির জন্যে কলকাতার উপরে ও উর্দু ছবির জন্যে লাহোর ও করাচীর উপরে সাময়িকভাবে নির্ভর করছিল। জনৈক পরাক্রান্ত পাকিস্তানী চলচ্চিত্র প্রযোজক ঘোষণা করেছিলেন যে ঢাকার পারিপার্শ্বিক

অবস্থা চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুকূল নয়। স্বনামধন্য নাট্যকার আবদুল জব্বর খান এই উক্তি খণ্ডন করতে, 1956 সালে তাঁর স্বরচিত নাটক থেকে 'মুখ ও মুখোস' নামে এক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এ এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা, কারণ সেই সময়ে কোন স্টুডিও বা প্রতিলিপি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত রসায়নাগারের সুবিধা ছিল না।

শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময়ে পূর্ববাংলা সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী। 'মুখ ও মুখোস'এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি 1957 সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন করেন। বাংলাদেশে চলচ্চিত্রশিল্পের এইখানেই শুরু। জনৈক সমালোচক প্রথম দিকের চলচ্চিত্রগুলিকে 'আবেগপ্রবণ অভিযান' বলে বর্ণনা করেছেন। এই চলচ্চিত্রগুলির 'বক্স অফিস' সাফল্য হয়নি, কারণ কলকাতার বাংলা ছবিই তখন বাজার জুড়ে আছে, আর নতুন কিছু এদের দেবারও ছিল না। তবু, এই সব চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব আবেদন ছিল। এই প্রথম বাংলাদেশের গ্রামের সৌন্দর্য চলচ্চিত্রে ধরা পড়ল। সামাজিক বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র সৃষ্টিরও ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছে।

এই যুগের অসামান্য ছবি 'নদী ও নারী', নির্মাতা সাদেক খান। ছবিটি তোলা 1965 সালে, অপূর্ব ও সংবেদনশীল ক্যামেরার কাজ। কল্পনানুগ সম্পাদনায় এর একটি ছন্দ রচিত হয়েছে। সেই ছন্দ খাপ খেয়েছে খামখেয়ালী পদ্মার মেজাজ ও বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে। নদীর সর্বনাশা ভাঙনের বিরুদ্ধে মানুষের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার সংগ্রামের কাহিনী এ। তার সঙ্গে আছে এক বদ্ধ সমাজের বুকে প্রেম ও অনুরাগের সমস্যার পটভূমিতে নদীর প্রাণদায়িনী জলের জন্য আকুল মমতা।

প্রায় একই সময়ে তরুণ জহীর রায়হানের চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ ঘটে। বাংলাদেশের অতি সংবেদনশীল চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অন্যতম জহীর রায়হান। তাঁর 1963 সালে নির্মিত 'কখনও আসেনি', ও 1964 সালের 'কাঁচের দেয়াল', নবগঠিত চলচ্চিত্রশিল্পে ঐতিহ্যস্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃত। আর একজন সমাজসচেতন চলচ্চিত্র-নির্মাতা, সুভাষ দত্ত, 1964 সালে 'সুতরাং' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই ছবিটি, ও পাকিস্তানী পরিচালক কারদার কৃত 'জাগো হুয়া সবেরা', সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্রের ২টি আন্তরিক প্রচেষ্টা। কারদারের ছবিটিতে কিছু কলকাতার শিল্পী-সমাগম রয়েছে।

1965 সালের ভারত-পাক যুদ্ধ চলচ্চিত্রশিল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিল। যেহেতু ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ হল, বাংলা ছবি কলকাতা থেকে আমদানী করা বন্ধ

হয়ে গেল। সেই ফাঁকটা ভরাট করল পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ছবি। এই ছবিগুলি ভারতের হিন্দী বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের সমগোত্রীয়। জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্যে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের পটভূমিতে উর্দু ছবির এই আক্রমণকে বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির উপরে আর একটি উদ্দেশ্যমূলক অত্যাচার মনে হল। যেমন অন্যান্য প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে, তেমনি চলচ্চিত্র নির্মাতারাও স্বকীয় সংস্কৃতির মূল সূত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। সালাউদ্দীন এক জনপ্রিয় যাত্রার ভিত্তিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেন 'রূপভান'। এর অসামান্য সাফল্য এক নতুন ধারার সৃষ্টি করল। পরবর্তী কয়েক বছরে, লোককাহিনীর উপরে ভিত্তি করে অন্ততঃ পঁচিশটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, যতদিন না এইধরণের ছবির আবেদন নিঃশেষ হয়ে যায়।

এতদিনে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র বাংলাদেশে কায়েমী আসন করে নিয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, মুখ্যতঃ জোর পড়ছিল আবেগবহুল পারিবারিক নাটক, রম্য অনুরাগ, সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা, এমনকি জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার একটা অস্পষ্ট আভাসের উপরেও। বৃহত্তর বাজারের সন্ধানে উর্দু চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়। ব্যবসার দিক থেকে এইসব ছবি এত অর্থকরী হয় যে পশ্চিম পাকিস্তান এদের প্রদর্শন প্রায় নিষিদ্ধ করে। একথা বলা খুব ভুল হবে না, যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপরে নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। আবার সেইসঙ্গে প্রতিযোগিতার অভাব শৈল্পিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগকে সীমিত করে।

স্বায়ত্তশাসনের জন্য ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি 1969 সালে একটা নতুন পর্যায় শুরু হয়। সামরিক শাসন, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের মত শক্তিশালী জনসংযোগের মাধ্যমের ক্ষেত্রে, ব্যাহত করে। তা সত্ত্বেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে জহীর রায়হানের 'জীবন থেকে নেওয়া' দুঃসাহসিক। শিল্প হিসাবে হয়তো সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ নয়, কিন্তু এই প্রথম চলচ্চিত্র যা কিছুটা উদ্ভাবিত পারিবারিক পরিস্থিতির আড়ালে সমসাময়িক বাস্তবকে প্রতিফলিত করে। সেইসময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়ায়, চলচ্চিত্রটি হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, এবং নিপীড়ন ও একনায়কত্বসুলভ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, অল্প কিছুকালের জন্য জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ছিল মুক্তিসংগ্রাম। চাষী নজরুলের 'ওরা এগারো জন', সুভাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', ও আলমগীর কবীরের 'ধীরে বহে মেঘনা', এই অল্পসংখ্যক চলচ্চিত্রের

মধ্যে শুধু যে জনপ্রীতি অর্জন করেছিল তাই নয়, সংগ্রামের নানাবিধ অবস্থাকে প্রতিফলিত করেছিল। এই মহাপ্লাবী অভিজ্ঞতার যে আবেগাত্মক, মনস্তাত্ত্বিক ও নাটকীয় দিক আছে, তার অনুসন্ধান এখনও অসম্পূর্ণ। 'মিতা'র 'আলোর মিছিল' যুদ্ধপরবর্তী কয়েকটি সামাজিক সমস্যার দিক সফলভাবে তুলে ধরেছে। তরুণ পরিচালক আনোয়ার কবীরের 1976 সালে নির্মিত চলচ্চিত্রে ধর্মীয় অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক আক্রমণ আছে। তাঁর 'সুপ্রভাত' 1977 সালে দিল্লীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এছাড়া, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরেই যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বাংলাদেশী চলচ্চিত্রশিল্প সেইধরণের কিছু সমস্যায় বিড়ম্বিত। হিসাব-বহির্ভূত অর্থ সদ্ব্যবহারের এটি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। ত্বরিত লাভের আশায় বাণিজ্যিক বাঁধাধরা গণ্ডীর চলচ্চিত্রের উপরেই ঝোঁক বেশী। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ আবার আরম্ভ হওয়ায় হিন্দী বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের প্রভাব গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। এইসব ঘটনার ফলে, স্বভাবতঃই ভারত থেকে চলচ্চিত্র আমদানীর ব্যাপারে প্রচণ্ড বিরোধিতা জেগে ওঠে।

চলচ্চিত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত সরকারী মালিকানার চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা। সরকার প্রযোজিত দলিলচিত্র ও সংবাদচিত্রের দায়িত্বও এদের উপরেই ন্যস্ত।

বুরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের মতে, বাংলাদেশের শিল্প, দেশের সমসাময়িক চরিত্রের তথা দেশের বিকাশের পরিবৃত্তির প্রতিফলন। এই উক্তিটি বিশেষভাবে যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একই সময়ে একথাও অনস্বীকার্য যে, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের জন্য গত কয়েক বৎসর ধরে একটা দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। লোক-ঐতিহ্যের গভীর মূলে এর শক্তি নিহিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক মুক্তবুদ্ধি আবহাওয়ায় লালিত বহু তরুণ বুদ্ধিজীবী, স্থানীয় ধর্মান্ধ ইসলামপন্থীর সহায়তায় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নির্বাচিত হত্যাকাণ্ডের বলি। তার ফলে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পূর্ণ হতে সময় লাগবে। আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে, উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দলকে ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বড় কঠিন যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে। এত আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে একটা রাষ্ট্রজাতির প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আত্মপরিচিতির সংগ্রাম,—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যার সর্বোত্তম প্রকাশ,—জয়ী হওয়া এখনও বাকী।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তোলার প্রচুর সুযোগ

আছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে প্রকাশিত বাংলা বই সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রচণ্ড আগ্রহ।

ভারতে যাঁরাই বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা আরো পড়ার জন্য উৎসুক। বাংলাভাষায় গবেষণা এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা সম্ভব। বাংলাদেশ ও ভারত, উভয় দেশের বাজারের প্রয়োজন মেটাতে পারলে, তার একটা অর্থনৈতিক উপকারিতা আছে, দামও কমানো সম্ভব।

বাংলাদেশে ভারতের বাংলা ও হিন্দী চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহ আছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের পারস্পরিক বাণিজ্যে বাধা পড়ে, কারণ এই চলচ্চিত্রের ভাষা বাংলা হওয়ায় ভারতে বাংলাদেশের ছবির দাবী সীমাবদ্ধ। যুক্ত প্রযোজনার সাহায্যে সে বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। তার অর্থ, উভয়ের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটা পথ খুলে যাওয়া। খরচের দিকটা ভাগ হয়ে যাওয়ায় উভয়েরই অপেক্ষাকৃত কম অর্থলগ্নীর প্রয়োজন, এবং বাংলাদেশ ও ভারতের বাজার যৌথভাবে খুলে যাওয়ায়, স্বল্পখরচে শিল্পসম্মত অথচ বাণিজ্যিকভাবে সফল চলচ্চিত্র নির্মাণের সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হবে। উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রচুর অবকাশ—তা সে যে ক্ষেত্রেই হোক, লোকজ অথবা ধ্রুপদী সঙ্গীত ও নৃত্য, নাটক, শিল্প, সাহিত্য, খেলাধুলা, টেলিভিশন ও বেতার প্রসারণ।

এই দুই দেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পূর্ণ স্বীকৃতির কাঠামোর মধ্যে সাংস্কৃতিক দান-প্রতিদান ও অর্থনৈতিক পরস্পর-নির্ভরতার যে বিরাট সম্ভাবনা আছে, তার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে এক আত্মপ্রতীত বাংলাদেশের আবির্ভাবের উপরে।

এক্ষেত্রে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি আছে বাংলাদেশের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের হাতে, কিন্তু সংখ্যায় তা মুষ্টিমেয়। গত পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের আমলে ক্রমান্বয়ে সুনির্বাচিত হত্যাকাণ্ড ও 1971 সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে গণহত্যা এর জন্য দায়ী। বাংলা ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবীর আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ এখনও অসমাপ্ত। এখানেই বাংলাদেশের বিয়োগান্ত বিধুরতা, হয়তো আশার আলোকও।

এই অন্বেষণ হয়তো একদিন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের স্বচ্ছতর, বিজ্ঞানসম্মত, বুদ্ধিগত ও পরিমিত আবেগবিহ্বল বোধশক্তিকে জাগ্রত করবে। একমাত্র তারই ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে একটা অকুণ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এমন একটা

সম্পর্ক শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্যও বটে। জুলফিকার আলি ভুট্টো তাঁর এক বিশেষ ক্ষুরধার মন্তব্যে যেমন বলেছিলেন: "উত্তরে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা ও চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত এই উপমহাদেশে এমন একটা কিছু আছে, যা আমাদের সকলকে একত্র রাখে, এবং পরস্পরের সঙ্গে বাস করার পথ খুঁজতে বাধ্য করে।"

বাংলাদেশের যে ছবি এখন দৃষ্টিপথে আসে তার শ্রেষ্ঠতম বর্ণনা পাওয়া যায় 'মূল্যবোধের জন্যে' নামে রচনা-সংকলনে হাসান হাফিজুর রহমানের উক্তি থেকে, যদিও সে-উক্তি অন্য সময়ে ও অন্য প্রসঙ্গে: "জীবিত নেতার চেয়ে নিহত নেতা হাজার গুণে শক্তিশালী আর সামনের শত্রুর চেয়ে অদৃশ্য শত্রু অনেক বেশী বিপজ্জনক।"

শেখ মুজিবকে যারা খুন করেছে তারা অদৃশ্য শত্রু; যারা তাঁর পিছনে ও পাশে ছিল। যারা খোলাখুলি তাঁর সম্মুখবিরোধিতা করেছে তারা নয়। তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের শক্তিগুলির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছেন—সহজ নয় জীবিতের চেয়ে শক্তিশালী এই মৃত নেতার সঙ্গে লড়াই করা। ক্রমশঃ আরো মানুষ, এমনকি উচ্চতম স্তরেও, এই বাস্তবকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। মনে পড়ে ঢাকার লালবাগ দুর্গের ভগ্নাবশেষের প্রশস্তিতে ফারুখ আহমেদের কবিতার কয়েকটি কথা:

> তোমাকে ফেলেছে ঘিরে সময়ের খর তরবার...
> মৃত্যু ও ক্ষয়ের স্পর্শে তবু তুমি হওনি কলুষ,
> আজাদী উষার তীরে দেখি আজও গৌরব তোমার।

লালবাগ দুর্গ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রতীক। □

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

আলি, এস. এম. — *আফটার দ্য ডার্ক নাইট*, টমসন প্রেস (ইণ্ডিয়া) লিঃ, নিউ দিল্লী, 1976.

আহমেদ, নফিস — *অ্যান ইকনমিক জিয়োগ্রাফী অফ ঈস্ট পাকিস্তান*, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, লণ্ডন, 1968.

— *এ নিউ ইকনমিক জিয়োগ্রাফী অফ বাংলাদেশ*, বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী, 1976.

ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অপারেশনস্, ঢাকা — *বাংলাদেশ : এ সার্ভে অফ ড্যামেজেস অ্যাণ্ড রিপেয়ার্স*, ভলিউমস্ I এবং II, ঢাকা, 1972.

উমর, বদরুদ্দীন — *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ভলিউম I, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, 1970.

— *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ*, মুক্তধারা, ঢাকা, 1975.

— *সংস্কৃতির সঙ্কট*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, 1970.

গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার — *স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাইজেস্ট অফ বাংলাদেশ*, নং 8, 1972, ঢাকা।

জাহান, রওনক — *পাকিস্তান : ফেলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন*, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ঢাকা, 1973.

দত্ত, কল্যাণ ও অন্যান্য — *বাংলাদেশ ইকনমি*, পিপল্‌স পাবলিশিং হাউস লিঃ, দিল্লী, 1973.

দাশগুপ্ত, আর. কে. — *রিভোল্ট ইন ঈস্ট বেঙ্গল*, এ. দাশগুপ্ত, দিল্লী, 1971.

ধর, ডি. পি. — *'ইমারজেন্স অফ বাংলাদেশ'*, সোস্যালিস্ট ইণ্ডিয়া, 12 অগাস্ট 1972.

নন্দী, প্রীতীশ
(অনুবাদক) — *বাংলাদেশ : এ ভয়েস অফ এ নিউ নেশন*, ডায়ালগ পাবলিকেশনস, কলিকাতা, 1971.

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট
পার্টি — *ডকুমেণ্টস অফ দ্য সেকেণ্ড কংগ্রেস*, ঢাকা, ডিসেম্বর 1973.

বিশ্বব্যাঙ্ক — *ওয়ার্লড ডেভেলপমেণ্ট রিপোর্ট, 1978*, ওয়াশিংটন ডি. সি., 1978.

— *অ্যানুয়াল রিপোর্ট, 1977*, ওয়াশিংটন ডি. সি., 1977.

— *অ্যানুয়াল রিপোর্ট, 1978*, ওয়াশিংটন ডি. সি., 1978.

বেতার ও তথ্য
মন্ত্রণালয় — *বাংলাদেশ*, ঢাকা, 1972.

ব্যানার্জি, সুব্রত — *এ ওয়ার্লড টু উইন*, জনতা, বোম্বাই, 20 জুন 1977.

ভট্টাচার্য, জি. পি. — *রেনেশাঁস অ্যাণ্ড ফ্রীডম মুভমেণ্ট ইন বাংলাদেশ*, মিনার্ভা অ্যাসোসিয়েটস, কলিকাতা, 1973.

ভারত সরকার,
বৈদেশিক মন্ত্রণালয় — *বাংলাদেশ ডকুমেণ্টস*, ভলিউম I এবং II, দিল্লী।

মজুমদার, আর. সি. — *হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল*, ভারতীয় বিদ্যা ভবন, বোম্বাই, 1954.

মামুদ, হায়াৎ — *মৃত্যুচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, 1968

ম্যাথিউ, জি. কে. — *'বাংলাদেশ : প্যালেস রেভোলিউশন কণ্টি-নিউস'*, ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, বোম্বাই, এপ্রিল 24, 1976.

রহমান, চৌধুরী শামসের — *বাংলাদেশ ; ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দ্য পিপল*, প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার, ঢাকা, 1973.

রহমান, শেখ মুজিবুর — *বাংলাদেশ মাই বাংলাদেশ*, মুক্তধারা, ঢাকা, 1972.

রহমান, হাসান হাফিজুর — *মূল্যবোধের জন্যে*, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, 1969.

রায়, নীহার রঞ্জন — *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, বুক এম্পোরিয়াম, কলিকাতা, 1949.

শহীদুল্লা, ডঃ মহম্মদ — *অভিনন্দন গ্রন্থ*, রেনেশাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, 1967.

শিল্পকলা আকাদমী — *শিল্পকলা*, ভলিউম I, 1978, ঢাকা।

সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক — *এ নেশন ইজ বর্ন*, কলিকাতা, 1974.

সরকার, সুমিত — *স্বদেশী মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল, 1903—1908*, পিপ্‌লস পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, 1973.

সেন, দীনেশ চন্দ্র — *বৃহৎ বঙ্গ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, 1935.

সেলার, এর্ণা — *রিপোর্ট অন দ্য মিশন অফ হাইলেভেল ইউনাইটেড নেশনস্ কনসালট্যানট্‌স টু বাংলাদেশ*, ভলিউমস্ I এবং II (মিমিওগ্রাফ্‌ড), ঢাকা, 1972.

হাই, এম. আবদুল — *বাংলাদেশ ইকনমি*, বিশ্ব পরিচয়, ঢাকা, 1974.

হুসেন, (মিসেস) মুহম্মদ (অনুবাদিকা) — *পোয়েমস্ ফ্রম ঈস্ট বেঙ্গল*, পাকিস্তান, পি. ই. এন. পাবলিকেশন, 1954.

□

নির্দেশিকা

ই

ঈ

উ

এ

ঐ

ও

ক

প

ফ

ব

ভ

ম

স

হ